মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা
জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৬ ।। জ্ঞানগঞ্জ আলাপ পুথি ২

উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা এবং আমরা - কি করিতে হইবে (না)

নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার

"'বিবাদার্ণবসেতু'তে বিধবার সম্পত্তির অধিকার ছিল। হ্যালহেড কোড মেয়েদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করল। অপুত্রক বিধবার সম্পত্তির অধিকার কাড়ল। সম্পত্তি পেল দত্তক পুত্র। মেয়ে দত্তক নিতে উৎসাহ দেখাল না কোম্পানি। উদ্দেশ্য– মেয়েরা যাতে সম্পত্তির অধিকার না পায়, খাজনা না দিতে পারে। কারন ইংলন্ডে তখনও মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। তারা উপনিবেশে কেন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেবে, কেনই বা জমিদারির অধিকার দেবে। একটাই রাস্তা এই অধিকার কেড়ে নেওয়া।"

আলোচনায়

অত্রি ভট্টাচার্য, দেবোত্তম চক্রবর্তী, বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

মৃদুল কুমার বাগচী স্মৃতি পুথিমালা
জ্ঞানগঞ্জ মাসিক পুথি ১৬ ।। জ্ঞানগঞ্জ আলাপ পুথি ২

উপনিবেশ বিরোধী চর্চা - কি করতে হইবে না - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
Uponibesh Birodhi Chorcha - Ki Korite Hoibe na - Nandini Bhattacharya Pandar Sakkhatokjar
অত্রি ভট্টাচার্য, দেবোত্তম চক্রবর্তী, বিশ্বেন্দু নন্দ

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।।* *গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৮এর পক্ষে প্রকাশনা করলেন অত্রি ভট্টাচার্য, বিশ্বেন্দু নন্দ

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, কোন্নগর, হুগলী

দাম ১০০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

পরম্পরা, উদ্ভাবন ও 'হিন্দু' আইন নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু কথা

অত্রি ভট্টাচার্য

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকের আইন প্রণয়নের নিগড়ে ছিল তথাকথিত 'হিন্দু ধর্মে'র নির্মিত সমসত্ত্ব আনুষ্ঠানিকতাকে উপনিবেশিতের আইনকাঠামো রূপে চালানোর প্রয়াস। ভদ্রবিত্তের বিশ্বাস, কোম্পানি বাহাদুর হিন্দু আইনের কোডিফিকেশন- বিশেষ করে সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম, লিপিবদ্ধ করেছিল, হিন্দু 'প্রজা'দের সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্রে উল্লেখিত তাদের নিজস্ব আইন দেওয়ার উদ্দেশ্যে। উপনিবেশের প্রথম যুগেই শাসকেরা ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি-সংহিতার অনুবাদের উদ্যোগ নেয় - যার ওপর ভিত্তি করে বাংলায় ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার অবকাঠামো হিসাবে দাঁড় করানো হয় কোড বা কম্পেনডিয়ামকে, যা ছিল বিবৃত, সংরক্ষিত ঐতিহ্যগত আইনের প্রামাণ্য টেক্সট তথা ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভাবিত বয়ান, যা তৈরী করতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোকে সহযোগিতা করেছিলেন বাংলার শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ডাইজেস্ট তৈরি করা পণ্ডিতদের অভিহিত করা হয়েছিল 'উকিল' আর 'আইনবিদ' হিসেবে। তারাই যে প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুদের আইন ব্যবস্থার' বিশেষজ্ঞ, এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসকেরা। ভারতবর্ষের অ্যাংলো-হিন্দু আইনশাস্ত্র বুঝতে গেলে ভারতবর্ষের একটি জটিল সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আইনগত ইতিহাস বোঝা জরুরি। অ্যাংলো-হিন্দু আইনশাস্ত্র একটি শক্তিশালী লিখন ঐতিহ্য—যেটি ধর্মশাস্ত্রের—মূলত যার মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকারের মতো বিষয়গুলিতে উপনিবেশ মনোযোগ স্থাপন করে, তাকে গ্রহণ, বর্জন ও উদ্ভাবন করে নিয়ে যায় নতুন অর্থ থেকে অর্থান্তরে— তাকে সবিশেষ জানা, বোঝা প্রয়োজন।

এই বিষয় নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'হিন্দু আইন'। ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে 'ধর্মশাস্ত্র' ছিল সেই বৌদ্ধিক ক্ষেত্র, যাকে সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের চালনার সঙ্গে এই ঐতিহ্যের অথবা পরম্পরার 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েসনে'। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালিত হিন্দু দেওয়ানি এবং ব্যক্তিগত আইন কোনোভাবেই 'খাঁটি দেশজ ঐতিহ্যে'র প্রতিনিধিত্ব করেনি। এটি হয়ে উঠেছিল, একটি ভদ্রবিত্তীয় ঔপনিবেশিক নির্মাণ, বাংলার নতুন শাসকের সাম্রাজ্যিক নকশা। জ্ঞান এবং ক্ষমতার মধ্যে যে, 'অনিচ্ছাকৃত সম্পর্ক' এবং 'উচ্চতর' ও 'নিকৃষ্ট'-র মধ্যে যে দ্বিধাবিভক্তি প্রাচ্যবাদ তৈরি করে, এই হিন্দু আইন নির্মাণ প্রক্রিয়া তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঔপনিবেশিক কোডিফিকেশন, আইন, রীতিনীতি, শিষ্টাচার সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আমলা-সাহিত্য সামগ্রিক রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সেই হিসেবেই ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় জ্ঞান এবং ক্ষমতার মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য সংযোগ গড়ে ওঠে। হেস্টিংস এবং উইলিয়াম জোন্স হিন্দু আইন ও রীতিনীতির সংহিতাবদ্ধ করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। ভারতের নতুন 'জাস্টিনিয়ান' হওয়ার কথা বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে গ্র্যান্ড জুরির সামনে। বাংলায় নব্য 'নাগরিক'দের ব্যক্তিগত বিষয়ে 'হিন্দু আইন' এর উপযোগীকরণ এবং ধর্মশাস্ত্রের

পুনঃসংজ্ঞায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। অথচ, ধর্মশাস্ত্র ছিল একটি বিশাল লিখন-ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য স্থির ছিল না— পরম্পরার বিবর্তনেরও ছিল নির্দিষ্ট গতি, অভিমুখ। আদপে এই তথাকথিত 'হিন্দু আইন' প্রবর্তন ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনিক উদ্ভাবন। প্রারম্ভিক ঔপনিবেশিক মতাদর্শের বাহক প্রশাসকেরা বারবার সেই প্রবাহমান ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, তাকে এই দেশের সমসত্ত্ব আইনি ঐতিহ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ধর্মশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্বেগ, আলাপ-আলোচনার বিষয় ছিল সম্প্রদায়, ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় আইনের ধারণার পাশাপাশি এর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি, স্পষ্টতই অনুপস্থিত ছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক সেই সাহিত্য-ঐতিহ্যের 'নিবন্ধ' এবং 'টীকা'তে ছিল না বাধ্যতামূলক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা সংরক্ষিত নির্দিষ্ট নিয়মের সংস্থান, যা ইউরোপীয় আইনকাঠামোর অপরিহার্য ভিত্তি তৈরি করেছে। ধর্মশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের মধ্যে, প্রারম্ভিক ঔপনিবেশিক যুগের এই 'উদ্ভাবন'কে গূঢ়পাঠে চিহ্নিত করলে বোঝা যায় ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা ধর্মশাস্ত্রের ঐতিহ্যকে 'আইন' হিসাবে কল্পনা করেছিলেন; এই ঐতিহ্যের মাধ্যমে তারা তাদের শাসনতান্ত্রিক উপযোগিতা সম্পন্ন করেন। শাস্ত্রীয় পরিসরের প্রেসক্রিপটিভ মতাদর্শিক নিয়মগুলির কোডিফিকেশনকে তারা অনুবাদ করেন আইনি কোড হিসাবে, সর্বোপরি এই আইনি কোডে জাতিরাষ্ট্রের সরকারী পছন্দ ও মতাদর্শের অন্তর্ভুক্তি হয়।

একদা এরিক হবসবম এবং টেরেন্স রেঞ্জার সম্পাদিত 'দ্য ইনভেনশন অফ ট্র্যাডিশন' বইটি জানান দিয়েছিল, যে সব ঐতিহ্য অতি পুরাতনী হিসেবে দাবি তোলা হয়, সেগুলি প্রায়শই উৎপত্তিগতভাবে সাম্প্রতিক এবং কখনও কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারা উদ্ভাবিত। সেই কারণে ঐতিহ্যকে অবশ্যই 'প্রথা' থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করতে হবে যা তথাকথিত 'প্রথাগত' সমাজে মতাদর্শিক আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। সেই পথ ধরে, আফ্রিকার জনসমাজে এই ঔপনিবেশিক 'পরম্পরা' উৎপাদনের ইতিহাস লিখেছিলেন টেরেন্স রেঞ্জার নিজেও। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, স্বাধীন গবেষক নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডা তার 'হিন্দু ল: ইনভেনশন অফ আ ট্র্যাডিশন অ্যান্ড লিগ্যাল মর্ডানিটি অফ ইন্ডিয়া' নিবন্ধে দুটি খুব জরুরী বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন— পঞ্চাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ভাষ্যকার রঘুনন্দনের 'ব্যবহারতত্ত্ব' সন্দর্ভ ব্যবহার করে জানিয়েছেন, শাস্ত্রের বিধানের চেয়ে অগ্রগামী ছিল সামাজিক বিধান। তবুও, যদি স্থানিক অমীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তির না হয়, তবে প্রজারা রাজার শরণাপন্ন হতেন এবং রাজা একজন 'প্রাড়বিবাক' (শাস্ত্র ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বিশেষ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ও হতে পারেন) করতেন। এই 'প্রাড়বিবাক' বর্গটি ছিল মূলত রাজার কাছে বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাংঘর্ষিক অভিমতের উপস্থাপক। অর্থাৎ, প্রাক-ঔপনিবেশিক বিচারকাঠামোতে রায়দানের অধিকার আদপেই ব্রাহ্মণ্যকেন্দ্রিক ছিল না। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে 'প্রাড়বিবাকো[হ]নুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্।।'-এর উল্লেখ সেই মীমাংসাপদ্ধতির দৃশ্যই উপস্থাপন করে। আবার একই নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতের তৃতীয় গভর্নর জেনারেল জন শোর, সম্পত্তির পরিচালনা তথা

'কালেকশন অফ রেভিনিউ' বিষয়ে একে অক্ষম মনে করছেন, ফার্মিঙ্গারের ফিফথ রিপোর্ট একে দুর্বল 'প্যাসিভ ইন্সট্রুমেন্টস' হিসেবে অভিহিত করছে। তাদের অস্ত্র হচ্ছে মনুর কুখ্যাত শ্লোক - 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে'।

ঔপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, এই যে সামাজিক আচার এবং শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রক্রিয়া নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার মত করে দৃঢ়ভাবে খুব কমই গবেষক বুঝেছেন। চর্চাদলের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলাপ, আশা করা যায় আপামর বাঙালি পাঠককে ঋদ্ধ করবে।

বিশ্বেন্দু নন্দের সংযোজন

২০২৩এর ১৪ আগস্ট, কলকাতায় নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জের আলাপচারিতায় ছিলাম বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য আর দেবোত্তম চক্রবর্তী। উদ্দেশ্য ছিল নন্দিনীদির 'এপ্রোপ্রিয়েশন এন্ড ইনভেনশন অব ট্রাডিশন - দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড হিন্দু ল ইন আর্লি কলোনিয়াল বেঙ্গল' বইতে আলোচিত, বঙ্গজ ভদ্রবিত্তকে ব্যবহার করে উপনিবেশের শাসকদের উদ্যমে বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কাড়ার প্রেক্ষিত বিশদে জানা, তার প্রভাব বোঝা। অমিয় কুমার বাগচী 'কলোনিয়ালিজম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমিতে' বইতে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশকে আখ্যা দিয়েছিলেন বিশ্বের প্রথম 'স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি' বাস্তবায়িত করা সরকার। জ্ঞানগঞ্জের আগামী দিনের কাজকর্মে এই আলাপচারিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে - বিশেষ করে জ্ঞানগঞ্জের উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার ক্ষেত্রে। জ্ঞানগঞ্জ মনে করে উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের অন্যতম উদ্যম হল, পলাশীর তিন দশকের মধ্যে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া, তাঁদের জমিদারি পরিচালনায় অযোগ্য ঘোষণা করা। ২০২৪এর মে ২, ৩, ৪ জ্ঞানগঞ্জ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার প্রথম সম্মেলনে নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডা কারিগর শ্রেষ্ঠ, বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, নেপালচন্দ্র সূত্রধর স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয় ছিল উপনিবেশের 'আদর্শ ভারতীয় নারী' নির্মাণ প্রক্রিয়া। পুথিতে বক্তৃতাটিও সংকলিত হল। একই সঙ্গে যুক্ত হল অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডের আইনে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার আলোচনা।

অমিয় কুমার বাগচী, উৎসা পট্টনায়েক, আদিত্য নিগম এবং আরও অনেক তাত্ত্বিক, আন্দোলনের সাথী উপনিবেশকে নতুন করে দেখতে শেখাচ্ছেন, বিশ্লেষণ করছেন। একই সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জও সেই উপনিবেশকে দেখছে জিডিপি অঙ্কের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা হকার কারিগর চাষীদের বিকেন্দ্রিভূত স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, কাঠামোর প্রেক্ষিতে। জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা, কর্পোরেট-বিরোধী চর্চার অন্যতম লক্ষ্য হল উপনিবেশ নির্মাণ প্রকল্পের নীতিগুলোকে চিহ্নিত করা, সে সবকে নথিভুক্ত করা। সেই নীতিমালার অন্যতমটি হল হ্যালহেড কোড নির্মাণ এবং বাংলার মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার বিনাশ। এই পুথি সেই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

HE FORMED A DIGEST OF HINDU AND MOHAMMEDAN LAWS

ঔপনিবেশিক হিন্দু আইন : একটি মুখবন্ধ

দেবোত্তম চক্রবর্তী

১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ানি লাভ করার আগে পর্যন্ত, ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য একই আইন প্রযোজ্য ছিল। বিশেষত তদানীন্তন বাংলার প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রতিটি নিজামত (ফৌজদারি) আদালতে অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তির বিষয়টি দেখভাল করতেন একজন কাজি, একজন মুফতি ও দুজন মৌলবি। তবে দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য ঔরঙ্গজেবের সময় থেকেই সুন্নি হানাফি স্কুলের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম আইনের একটি সারসংক্ষেপ— *ফতোয়া-ই-আলমগিরি*— বলবৎ থাকলেও হিন্দুদের জন্য আলাদাভাবে নির্দিষ্ট কোনও গ্রন্থ কিংবা বিধিবদ্ধ আইন প্রচলিত ছিল না। সেই সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দুরা সচরাচর স্থানীয় স্তরেই তাঁদের যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করতেন। যদি কোনও ব্যক্তি সেই মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হয়ে দেওয়ানি আদালতের শরণাপন্ন হতেন, সেক্ষেত্রে উত্তরাধিকার, বিবাহ, জাতপাত এবং ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য, আদালতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য বা পরামর্শ নেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

যদিও এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও তাঁরা কোনও সময়েই তাঁদের মর্জিমাফিক এই বিবাদ-বিরোধের মীমাংসা করতেন না, এমনকি পণ্ডিতদের মতামতকে আইন হিসাবে বিবেচনাও করা হত না। এই প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ভাষ্যকার রঘুনন্দন *ব্যবহারতত্ত্ব* গ্রন্থে জানিয়েছেন, শাস্ত্রীয় রীতিনীতিগুলির চেয়ে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্থানীয় স্তরে কোনও বিরোধের সমাধান না করা গেলে, তার নিষ্পত্তির জন্য বিবদমান গোষ্ঠী রাজার শরণাপন্ন হবে। সেক্ষেত্রে রাজা একজন 'প্রাড্‌বিবাক' (শাস্ত্র ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ও হতে পারেন) নিয়োগ করবেন। এই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকে প্রশ্ন করার পরে তাঁর মতামত উপস্থাপন করলে রাজা চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবেন। ফলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থায় যাবতীয় আইনি বিবাদের মীমাংসার বিষয়ে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা নন, রাজা কিংবা আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ কাজিই ছিলেন চূড়ান্ত রায়দানের অধিকারী।

কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসন প্রথম থেকেই স্থির করে, ভারতীয়দের ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মুসলিম ফৌজদারি আইন দ্বারা আগের মতোই শাসিত থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক দেওয়ানি আইন চালু হবে। তাই ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই তারা প্রচলিত আইনব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেয় এবং কেবল নিজেদের

স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনামাফিক এই বিভাজনমূলক কাজটি সম্পাদন করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। এই বিষয়ে সলতে পাকানোর কাজটি মূলত শুরু করেন স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton), হলওয়েল (John Holwell), বোল্টস (William Bolts), ভেরেলস্ট (Harry Verelst) প্রমুখ কোম্পানির কিছু হর্তাকর্তা।

যেমন সংস্কৃত ভাষা এবং ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে বিশুদ্ধ গণ্ডমূর্খ স্ক্র্যাফটন ১৭৭০ সালে বলেন:

> ব্রাহ্মণরা বলে, তাদের আইন প্রণেতা ব্রুমা [ব্রহ্মা] তাদের জন্য বিদম [বেদ] বলে একটি বই রেখে গেছেন, যেখানে সমস্ত মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলে, যে মূল ভাষাতে এটি লেখা হয়েছিল সেটি হারিয়ে গেছে এবং বর্তমানে তাদের কাছে কেবল একটি ব্যাখ্যা আছে, যাকে শাস্তহ (SHASTAH) [শাস্ত্র] বলা হয়। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, যা বর্তমানে একটি মৃত ভাষায় পরিণত এবং যারা এই ভাষার অধ্যয়ন করে, কেবল সেই ব্রাহ্মণদের কাছে পরিচিত। ...যদিও লাহোর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত মহাদেশের সমস্ত জেন্টু [হিন্দু] বিদমকে স্বীকার করে, তবুও তারা এর [শাস্ত্র] ভেতরে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে ...।

বলা বাহুল্য, তাঁর 'SHASTAH' শব্দটি ধর্মশাস্ত্রের ইঙ্গিত করলেও সেই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত ছিল, সে বিষয়ে আমরা অচিরেই মনোযোগী হব। একই সুরে স্ক্র্যাফটনের বক্তব্যের প্রায় অনুবৃত্তি করে *The History of Hindostan* গ্রন্থের লেখক আলেকজান্ডার ডাও বলেন:

> প্রত্যেক মুসলমান, যারা কোরান বিড়বিড় করতে পারে, কোনও অনুমতি বা নিয়োগপত্র ছাড়াই নিজেকে একজন বিচারকের পদে উত্থাপন করে এবং প্রতিটি ব্রাহ্মণ কোনও নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তার নিজস্ব মর্জিমাফিক ন্যায়বিচার বিতরণ করে।

স্ক্র্যাফটন কিংবা ডাও-এর এই অপরিসীম অবজ্ঞাসূচক ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্যসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট, তাঁরা প্রাক্-ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

একই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং অতীতের বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে দেওয়ানি লাভের মাত্র ৭ বছরের মধ্যেই গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস, পৃথক 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' দেওয়ানি আইনের সংকলন গ্রন্থ তৈরি করার বিষয়ে উদ্যমী হন। ১৭৭২-এর ১৫ অগস্ট সরকারিভাবে ঘোষিত হয়:

> উত্তরাধিকার, বিবাহ, জাতপাত ও অন্যান্য ধর্মীয় আচরণ বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সমস্ত মামলায়, মুসলমানদের কোরানের আইনসমূহ এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে শাস্ত্রব্যবস্থা চিরকাল সম্মানের সঙ্গে মেনে চলতে হবে। এই সমস্ত [মামলা] উপলক্ষে যথাক্রমে মৌলবিরা বা ব্রাহ্মণরা আইনটির ব্যাখ্যা করার জন্য [আদালতে] উপস্থিত থাকবেন এবং তারা রিপোর্টে স্বাক্ষর করে ডিক্রি পাস করতে সহায়তা করবেন।

হেস্টিংসের দৌলতে এই প্রথম ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আইনত প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে। তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তা ও আর্থিক অনুদানের ভিত্তিতে পণ্ডিত ও মৌলবিদের সাহায্য নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য এই বিষয়ে দুটি পৃথক

সংকলন গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এই সংকলন গ্রন্থ তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল - ক) আরবি ও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ইংরেজ বিচারকদের রায়দানের বিষয়ে সহায়তা করা এবং খ) তাঁদের রায়দানের ক্ষেত্রে আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবিদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টি যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলে এই শ্রেণিটিকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়া।

অথচ যে ধর্মশাস্ত্রের ওপর ব্রিটিশরা এত গুরুত্ব আরোপ করে তাকে 'আইন'-এ পর্যবসিত করে, সেই ধর্মশাস্ত্রগুলি কোনও কালেই হিন্দুদের কাছে 'আইন' হিসাবে বিবেচিত হত না। এই গ্রন্থগুলি ছিল মূলত তাদের 'code of conduct' বা আদর্শ আচরণবিধির দ্যোতক। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডুরং বামন কাণে বলেন:

> ধর্মশাস্ত্রকাররা 'ধর্ম' বলতে কোনও ধর্ম নয়, বরং এমন জীবনযাপন বা আচরণবিধির কথা বলেছেন, যা সমাজের সদস্য হিসাবে একজন ব্যক্তির কর্ম ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যাকে মানব অস্তিত্বের লক্ষ বলে মনে করা হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে সেখানে পৌঁছতে সক্ষম করে তোলে।

ফলত স্বাভাবিকভাবেই প্রাক্-ঔপনিবেশিক আদালতে ধর্মশাস্ত্রগুলি কোনও দিন আইনের মর্যাদা পায়নি। যদিও ১৭৭৩ সালের অক্টোবরে ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল হওয়ার অব্যবহিত পরে, হেস্টিংস এই উদ্দেশ্যে চালু করেন 'Regulating Act' বা নিয়ামক আইন। তারই অনুষঙ্গে সরকারি ব্যয়ে ও হেস্টিংসের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ প্রক্রিয়া জোরকদমে শুরু হয়ে যায়। ইংরেজিতে এই অনুবাদের দায়িত্ব পান ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।

তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। এই কারণে দায়িত্ব পাওয়ার পরে, তিনি বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১১ জন পণ্ডিতকে - রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত - এই অনুবাদের কাজে নিয়োগ করেন। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক হিন্দু আইনের জন্য সংকলন গ্রন্থটিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, অপরিচিত ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার, দত্তকগ্রহণ, জমি চাষে ভাগের পরিমাণ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতির জন্য জরিমানা, ঋণ, দাসত্ব, মানহানি, ব্যভিচার, জালিয়াতি, বিক্রয়কর ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই গ্রন্থটিতে আলোচিত বিষয়গুলির বিস্তৃত পরিসর ইঙ্গিত দেয় যে, সংকলকদের নির্দিষ্ট কোন কোন বিষয়ের উপর মন্তব্য করতে হবে, সে ব্যাপারে হ্যালহেডের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। অবশেষে গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে ১৭৭৩-এর মে থেকে এই অনুবাদকর্ম শুরু হয়ে শেষ হয় ১৭৭৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। সংকলন গ্রন্থটির নাম

দেওয়া হয় *বিবাদার্ণবসেতু*। প্রথমে এই সংকলনটি ফারসিতে অনূদিত হয় ও পরে তাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন স্বয়ং হ্যালহেড। ১৭৭৬ সালে এটি *A Code of Gentoo Laws, or, Ordinations of the Pundits* নামে প্রকাশিত হয়।

আইনটির আওতায় নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলেও এই আইন প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল - ক) বৃহৎ জমিদারদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ও খ) তদানীন্তন বাংলার একাধিক মহিলা জমিদারদের সম্পত্তি সুকৌশলে হাতিয়ে নেওয়া। পলাশি যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকেই কোম্পানি অস্বাভাবিক হারে রাজস্ব আদায় করতে শুরু করে। এই কারণে ১৭৬০ সালে বীরভূমের রাজা আসাদ জামান খান বর্ধমানের রাজার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন। পরবর্তী কয়েক দশক জুড়ে মেদিনীপুরের রামরাম সিং, ধলভূমের রাজা (১৭৬৯-৭৪), রংপুরের জমিদার (১৭৮৩), বিষ্ণুপুরের জমিদার (১৭৮৯) প্রমুখ ব্রিটিশ শাসকদের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করেন। বিদ্রোহী রাজা ও জমিদারদের আয়ত্তে আনতে যে আইনি ছলচাতুরি করা হয়, এই আইনটির সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রে বিবৃত বিধির তুলনামূলক আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে।

সম্পত্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠপুত্রের অগ্রাধিকারের কারণ হিসাবে *মনুসংহিতা*-র নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে:

জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি।।
যস্মীন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্তমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ।।
পিতেব পালয়েৎ পুত্রান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতন্ যবীয়সঃ।
পুত্রবচ্চাপি বর্ত্তেরন্ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্ম্মতঃ।। ৯. ১০৬-০৮

জন্ম হওয়া মাত্রই জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারা মানব পুত্রবিশিষ্ট হয় এবং [পুন্নাম নরক থেকে নিস্তার পেয়ে] পিতৃঋণমুক্ত হয়। [তাই] জ্যেষ্ঠই পুত্রপদবাচ্য, মধ্যমাদিরা তা নয়, এ কারণে জ্যেষ্ঠ সকল ধনসম্পদ পাওয়ার যোগ্য। যে জ্যেষ্ঠের উৎপত্তিমাত্র পিতা পিতৃঋণ শোধ করেন এবং যার দ্বারা পিতা মোক্ষলাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠকে ধর্মজ সন্তান বলা যায়। যেহেতু কনিষ্ঠ পুত্ররা কামহেতু উৎপন্ন হয়, সেহেতু এদের কামজ সন্তান বলা যায়। অতএব জ্যেষ্ঠ সকল পৈতৃক ধনসম্পদ পাওয়ার যোগ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করে পিতা যেমন পুত্রদের প্রতিপালন করেন, তেমনভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতিপালন করবেন এবং কনিষ্ঠেরা পিতার মতো জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকবেন।

তবে এই শ্লোকত্রয়ের পরবর্তী দুটি শ্লোকে এই ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন করে মনু জানান:

জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্য যদ্বরম্।
ততো[হ]র্দ্ধং মধ্যমস্য স্যাত্ত রীয়স্তু যবীয়সঃ।।
জ্যেষ্ঠশ্চৈব কনিষ্ঠশ্চ সংহরেতাং যথোদিতম্।

যে[হ]ন্যে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং তেষাং স্যান্মধ্যমং ধনম্।। ৯. ১১২-১৩

যখন সমস্ত ভাই মিলে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করবেন, তখন সমস্ত সম্পত্তি বিশ ভাগ করে তার এক ভাগ জ্যেষ্ঠকে দেবেন। মধ্যমকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং সর্বকনিষ্ঠকে আশি ভাগের এক ভাগ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি সকলে সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। অন্য ভাইয়েরা মধ্যম ভ্রাতার মতোই চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পাবেন।

এই বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের দুই প্রধান ভাষ্যকার - *দায়ভাগ*-এর জীমূতবাহন এবং *মন্বর্থমুক্তাবলী*-র কুল্লুকভট্ট - একই কথা বলেন।

কিন্তু লোকাচার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকে অমান্য করে আইনে স্পষ্ট বলা হয়:

যদি কোনও ব্যক্তি মারা যায় বা কোনও অপরাধের জন্য তার গোত্র, তার আত্মীয়স্বজন এবং স্বজাতি থেকে বহিষ্কৃত হয় বা তার সমস্ত সম্পত্তি - জমি বা অর্থ বা গবাদি পশু বা পাখি - ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তা [সম্পত্তি] তার পুত্র পাবে; যদি একাধিক পুত্র থাকে তবে তারা সবাই সমান ভাগ পাবে।

এভাবে প্রথমে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠপুত্রের যে অতিরিক্ত অংশ প্রাপ্য, আইনের সাহায্য নিয়ে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় এবং সেই সম্পত্তি সমস্ত পুত্রের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আইনে আরও বলা হয়, একইভাবে পুত্রের অনুপস্থিতিতে পৌত্রদের মধ্যে এবং পৌত্র না থাকলে প্রপৌত্রদের মধ্যে সম্পত্তিটি বিভক্ত করা উচিত। এই যুগপৎ আইনি পরিবর্তনের ফলে জমিদারির আয়তন ক্রমশ ছোট হতে শুরু করে। ফলে এক দিকে যেমন কোম্পানির পক্ষে একটি বৃহৎ জমিদারির পরিবর্তে অসংখ্য ক্ষুদ্র জমিদারিগুলিকে শাসন করা সহজ হয়ে যায়, অন্য দিকে তেমনই এই জমিদারিগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করার পথটিও সুগম হতে শুরু করে। একই উপায়ে ধূর্ত ইংরেজরা আইনি আবডালের সাহায্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গটিকে ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক করে তোলে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে নারীদের বঞ্চিত করতে শুরু করে।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হিন্দুদের সম্পত্তি বিভাজন ও উত্তরাধিকারের বিষয়ে দুটি টীকাভাষ্য - দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা - মান্য করার চল ছিল। বাংলা ও অসম ছাড়া গোটা দেশে বিজ্ঞানেশ্বর (আনুমানিক ১১০০ সাল)-এর মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত থাকলেও বাংলা ও অসমে মূলত বঙ্গীয় নিবন্ধক জীমূতবাহন (আনুমানিক ১১০০-১১৫০ সাল)-এর দায়ভাগ প্রথা চালু ছিল। দায়ভাগের প্রধান তিনটি ভাষ্য হল - জীমূতবাহন-এর *দায়ভাগ*, রঘুনন্দন-এর *দায়তত্ত্ব* ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-এর *দায়ক্রমসংগ্রহ*। অন্য দিকে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মিতাক্ষরা চালু থাকলেও সর্বত্র বিজ্ঞানেশ্বর-এর মূল ভাষ্যকে মান্য করা ছাড়াও সর্বমোট চারটি ভিন্ন ধারা ছিল - ১. *বীরমিত্রোদয়*-এর বেনারস ধারা, ২. *বিবাদরত্নাকর*, *বিবাদচন্দ্র* ও *বিবাদচিন্তামণি* আশ্রিত মিথিলা ধারা, ৩. *ব্যবহারমুখ্য*, *বীরমিত্রোদয়* ও *নির্ণয়সিন্ধু*-র ওপর গুরুত্ব আরোপ করা মহারাষ্ট্র ধারা এবং ৪. *স্মৃতিচন্দ্রিকা*, *ব্যবহারনির্ণয়* ও *সরস্বতীবিলাস* আশ্রিত দ্রাবিড় ধারা। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষে সম্পত্তি বিভাজন ও উত্তরাধিকারের

বিষয়ে কেবল একটি বিধি বা প্রথা মান্য করার চল ছিল না, বরং অঞ্চলভেদে যথেষ্ট তারতম্য ছিল।

সংক্ষেপে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মধ্যে প্রধান তিনটি পার্থক্য হল -

ক) দায়ভাগ অনুযায়ী কোনও সম্পত্তির অধিকারীর মৃত্যুর পরে কিংবা তিনি যদি সামাজিকভাবে 'পতিত' হন বা সন্ন্যাসী হন, কেবল তখনই সেই সম্পত্তির পরবর্তী উত্তরাধিকারীর প্রসঙ্গ উঠতে পারে। কিন্তু মিতাক্ষরা মতে, পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র জন্মগতভাবে পিতা বা অন্য পূর্বপুরুষের পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জন করতে পারে। খ) দায়ভাগ অনুসারে পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে বাঙালি হিন্দুর সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে সেই সম্পত্তি দান বা বিক্রি করতে পারেন। কিন্তু মিতাক্ষরা অনুযায়ী যেহেতু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতার সঙ্গে পুত্রের সমান স্বত্ব জন্মায়, সেহেতু পিতা তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের সম্মতি ছাড়া তাঁর সম্পত্তি অবাধে দান বা বিক্রি করতে পারেন না। গ) দায়ভাগ মতে, কেবল পৃথগন্ন পরিবারে নয়, এমনকি অবিভক্ত অর্থাৎ যৌথ পরিবারেও অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পরে, তাঁর বিধবা পত্নী তাঁর স্বামীর বিভক্ত বা অবিভক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সমগ্র অংশের মালিকানা লাভ করতে পারেন। তবে তিনি সেই সম্পত্তি অন্য কাউকে দান বা বিক্রি করতে পারেন না। কিন্তু মিতাক্ষরা অনুযায়ী, কোনও অপুত্রক বিধবা তাঁর স্বামীর কেবল বিভক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে সেই সম্পত্তি তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে নয়, তাঁর স্বামীর পরবর্তী উত্তরাধিকারী অর্থাৎ তাঁর ভাইদের কাছে চলে যাবে। আর যৌথ হিন্দু পরিবারের সদস্য হিসাবে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় শুধুমাত্র ভরণপোষণ পেতে পারেন, পরিবারের সম্পত্তিতে তাঁর অন্য কোনও অধিকার নেই।

তদানীন্তন ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায়, প্রচলিত ঐতিহ্য ও শাস্ত্র - দু'দিক থেকেই সম্পত্তিতে নারীদের, এমনকি বিধবাদেরও অধিকারের বিষয়টিকে মেনে নেওয়া হয়। এই সময়ে বাংলার যে তিনটি অন্যতম বৃহৎ জমিদারির প্রত্যেকে কোম্পানিকে বছরে ১ লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি রাজস্ব দিত, সেই তিনজন জমিদারই ছিলেন মহিলা ও বিধবা। বছরে ৩৫০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি রাজস্ব দেওয়া বর্ধমান ছিল তিলকচাঁদের বিধবা পত্নী ও তেজচাঁদের জননী রানি বিষ্ণুকুমারীর শাসনাধীন। ২৬০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি বার্ষিক আদায়যুক্ত রাজশাহী শাসন করতেন শ্রদ্ধেয়া রানি ভবানী, যিনি ১৭৪৮ সালে রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে রাজশাহীর রাজকার্য পরিচালনার ভার নিজের হাতে নেন। আর কোম্পানিকে বছরে ১৪০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি খাজনা দিতেন দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী রানি সরস্বতী।

কিন্তু সমসাময়িক ইংল্যান্ডে মহিলাদের সম্পত্তির মালিকানা পাওয়া কিংবা তার পরিচালনা করার অনুমতি ছিল না। ফলত তৎকালীন রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বর্ধমানের রানি বিষ্ণুকুমারী, নাটোরের রানি ভবানী, দিনাজপুরের রানি সরস্বতী, মহিষাদলের রানি জানকী, তমলুকের রানি কৃষ্ণপ্রিয়া ও

সন্তোষপ্রিয়া, কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি কিংবা মেদিনীপুর বা রাজশাহীর একাধিক মহিলা জমিদারদের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দাপট ও দক্ষতার বিষয়টিকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। দেওয়ানি ব্যবস্থা চালু ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন - এই মধ্যবর্তী টালমাটাল সময়কালে, ব্রিটিশরা তাদের শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও শক্তিশালী করে তোলার জন্য বাংলার বিদ্রোহী রাজা ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু রাজস্ব প্রদানকারী বাংলার মহিলা জমিদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাঁদের আয়ত্তে আনা শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সম্পত্তির অধিকার থেকে মহিলাদের সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করার জন্য, তারা অস্ত্রের পরিবর্তে আইনের সাহায্য নিয়ে নারীদের সম্পত্তিগুলিকে পুরুষদের হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করে।

এই বক্তব্যের সমর্থনে কেবল তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। প্রথমত, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে, এই আইন তৈরি করার সময়ে ব্রিটিশরা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের মূল দুটি শাখা - মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ - সম্পর্কে চূড়ান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলাতে প্রচলিত দায়ভাগ অনুযায়ী কেবল পৃথগন্ন পরিবারেই নয়, যৌথ পরিবারেও অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা পত্নী তাঁর স্বামীর সম্পত্তির সমগ্র অংশের মালিকানা লাভ করতেন। শুধু তাই নয়, দায়ভাগ অনুসারে পিতার মৃত্যুর পরে পিতৃসম্পত্তির বিষয়ে অবিবাহিতা কন্যারাও পুত্রদের সঙ্গে সমান অংশের অধিকারী ছিল। কিন্তু এই প্রচলিত ঐতিহ্যকে মান্য করার বিষয়ে শাসকদের তীব্র অনিচ্ছার কারণেই *বিবাদার্ণবসেতু* সংকলনের সঙ্গে জড়িত ১১ জন বাঙালি পণ্ডিত বাংলায় প্রচলিত দায়ভাগ ব্যবস্থা সম্পর্কে নীরব থাকতে বাধ্য হন। ফলে বাংলার বিধবারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করেন।

দ্বিতীয়ত, এই আইনটিতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বিভাজনের বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম অথচ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়। দায়ভাগ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির কোনও পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রের অবর্তমানে উক্ত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী সেই সম্পত্তির পরবর্তী উত্তরাধিকারী হতেন। কিন্তু হ্যালহেডের আইনটিতে এই বিষয়ে মৃত ব্যক্তির দত্তক পুত্রের উল্লেখ করে বলা হয়:

> যদি কোনও পুরুষের পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকে, তাহলে তার সমস্ত সম্পত্তি তার দত্তক পুত্র পাবে। যদি কোনও দত্তক পুত্র না থাকে, তবে তা দত্তক পুত্রের পুত্র পাবে। যদি কোনও দত্তক পুত্রের পুত্র না থাকে, তবে তা দত্তক পুত্রের পৌত্র পাবে।

এ কথা সত্যি যে, বাংলায় একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য দত্তক পুত্র নেওয়ার প্রথা চালু ছিল। বিশেষত বিধবারা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের থেকে তাঁদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য পুত্রদের দত্তক নিতেন। উদাহরণস্বরূপ, অপুত্রক রানি ভবানী শেষ জীবনে দত্তক পুত্রের হাতে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব সঁপে দেন কিংবা অপুত্রক রানি সরস্বতী রাধানাথকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রথার মাধ্যমে সম্পত্তি তাঁদের হাতেই

থাকত, পরিবারের অন্যদের কাছে যেত না। আরও আশ্চর্যের কথা এই, মূল সংকলন গ্রন্থ *বিবাদার্ণবসেতু*-তে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও করা হয়নি। এটি শুধুমাত্র বিবিধ বিভাগে শেষের দিকে দায়সারাভাবে উল্লিখিত হয়। কাজেই অনুবাদের সময় হ্যালহেড যে এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনটি করেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

শুধু তাই নয়, *মনুসংহিতা*-র নবম অধ্যায়ের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে:

> ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
> ভজেরন্ পৈতৃকং রিকথ্মনীশাস্তে হি জীবতোঃ।। ৯. ১০৪
>
> পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিত হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করবে; কারণ তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রগণ [সম্পত্তির] অধিকারী নয়।

অথচ আইনে লেখা হয়:

> If a Man, having a Wife, and Sons born from that Wife, dies, ... so long as that Wife lives, it is not a right and decent Custom, that those Sons should share, and receive among themselves the Property left by that Person; if the Wife aforesaid gives them Instructions accordingly, then the Sons have Authority to divide it: At the Time of Division, if the Wife is desirous to receive a Share, she shall take One Share, at the Rate of the Share of One Son....

অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পরে, মাতার জীবদ্দশায় সম্পত্তি ভাগ করা 'যথাযথ ও শালীন' প্রথা নয়। তবে 'তিনি যদি সেই বিষয়ে নির্দেশ দেন তবে পুত্রদের সম্পত্তি ভাগ করার অধিকার আছে' এবং 'স্ত্রী যদি অংশীদার হতে আগ্রহী হন, তবেই তিনি তার ছেলের সঙ্গে সমান অংশ পাবেন'। ঔপনিবেশিক শাসকদের বদান্যতায়, প্রথমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে দত্তক পুত্রের উল্লেখ করে এবং পরে বিধবা স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই সেই সম্পত্তি ভাগ করার আইনি অনুমতি প্রদান করে, বিধবাদের আর্থিক দিক থেকে পঙ্গু করে দেওয়ার পিতৃতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি সমাজে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসে।

তৃতীয়ত, এই বিষয়ে স্ত্রীধনের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে আইনটিতে সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি ঘটানো হয়। 'স্ত্রীধন' হল মহিলাদের একচেটিয়া সম্পত্তি যা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যথা বিবাহের আগে ও পরে পিতামাতা, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, নিকটাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব প্রমুখ মহিলাদের দান করেন। *মনুসংহিতা*-র নবম অধ্যায়ের ১৯৪ সংখ্যক শ্লোকে 'স্ত্রীধন' সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়ে মনু বলেছেন:

> অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।
> ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্।।
>
> স্ত্রীধন [অন্ততপক্ষে] ছ'টি সূত্রে অর্জিত হতে পারে - অধ্যগ্নি (বিবাহের সময়ে পিত্রাদিদত্ত ধন), অধ্যাবাহনিক (পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহ গমনের সময় স্ত্রীর লব্ধ ধন), প্রীতিদত্ত (বিবাহের সময়ে ও পরে স্বামী ও অন্যদের দেওয়া নানা উপহার) এবং যে কোনও সময়ে ভ্রাতৃদত্ত,

মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত উপহার।

এই স্ত্রীধন নারীরা আমৃত্যু তাঁদের নিজস্ব সম্পদরূপে রেখে দিতে পারতেন। কেবল মাতার মৃত্যুর পরেই তাঁর পুত্রকন্যারা সেই স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী হতে পারত। এই কারণে স্ত্রীধনই ছিল বিধবাদের রক্ষাকবচ।

স্বামীর মৃতুর পরে বিধবাদের আর্থিক দুর্দশা লাঘবের জন্য মনু যে বিধান দিয়েছিলেন, তা হল:

> পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
> ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে।। ৯. ২০০
>
> পতির জীবদ্দশায় স্ত্রী তাঁর অনুমতিতে যে অলংকার ধারণ করবেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে তা উত্তরাধিকারীরা ভাগ করতে পারবে না। করলে তারা পতিত হবে।

কিন্তু হ্যালহেডের আইনে বলা হয়:

> WHATEVER Woman be of a Disposition altogether malevolent, or wanting in female Modesty, or careless of her Property, or unchaste, such Woman is incapable of possessing what has been specified to be a Woman's Property.

এভাবেই আইনে বিধবাদের 'শালীনতা' ও 'সতীত্ব' রক্ষা করার নিখাদ পিতৃতান্ত্রিক অছিলায় সম্পত্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের বঞ্চিত করার প্রথা শুরু হয়।

একই কারণে এই ঔপনিবেশিক আইনে সতীপ্রথার ওপর অভূতপূর্ব গুরুত্ব আরোপ করে লেখা হয়:

> স্বামীর মৃত্যুর পরে তার মৃতদেহের সঙ্গে তার স্ত্রীর আগুনে আত্মাহুতি দেওয়াই যথাযথ। প্রত্যেক স্ত্রী, যে এভাবে [আগুনে] আত্মাহুতি দেবে, সে তার সৌভাগ্যের জন্য স্বামীর সঙ্গে সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গে থাকবে। যদি সে আত্মাহুতি না দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই অলঙ্ঘনীয় সতীত্ব রক্ষা করতে হবে। যদি সে সর্বদা সতীত্ব বজায় রাখতে পারে, তবে সে [মৃত্যুর পরে] স্বর্গবাসী হবে; আর যদি সতীত্ব রক্ষা না করে, তবে সে নরকে যাবে।

হ্যালহেডের আইনটির মাধ্যমে বিধবাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এবং 'সতীত্ব' বজায় রেখে জীবনযাপন করার যে প্রথা চালু হয়, তার রেশ ঔপনিবেশিক শাসনপর্বের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

হ্যালহেডের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে *বিবাদার্ণবসেতু* নামে ধর্মশাস্ত্রের কোনও ভাষ্য বা নিবন্ধের অস্তিত্বই ছিল না। ব্রিটিশ শাসকদের বদৌলত এই অর্বাচীন ও অকিঞ্চিৎকর সংকলন গ্রন্থটিই শেষ পর্যন্ত আইনি কেতাবে পরিণত হয়। শুধু হিন্দুরাই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায় সমেত শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মানুষরাও তার আওতাভুক্ত হতে বাধ্য হন। হেস্টিংস-হ্যালহেড জুটি সচেতনভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেন, পরবর্তীকালে কর্নওয়ালিস-জোন্স জুটি তাকে সযত্নে লালন করে আরও পুষ্ট করে তুলবেন। নারীদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভুলক্রমে যতটুকু ফাঁক রেখে যাবেন হ্যালহেড, পরবর্তী আইনটিতে তাঁর

অনুগত শিষ্য জোন্স সেটুকুও ভরাট করে দিয়ে শাসকের পরম প্রার্থিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরবেন। আর তাঁর দৌলতে *মনুসংহিতা* হয়ে উঠবে হিন্দুদের সবচেয়ে 'প্রাচীন' ও 'প্রামাণ্য' আইনগ্রন্থ।

২

১৭৭৬ সালে হ্যালহেডের আইনটি চালু করার সময়ে, ইংরেজরা রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালালেও কোনও স্থায়ী সমাধানের উপায় খুঁজে পায়নি। বরং এই আমলে অস্বাভাবিক হারে রাজস্ব আদায়ের কারণে, বাংলা ও বিহারের কতিপয় ক্ষমতাশালী রাজা ও জমিদার যে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রথমে হ্যালহেডের আইন ও পরে ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে, এই জমিদারশ্রেণি ক্রমে শাসকের প্রতি বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করে তাদের প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠে। প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বৃহত্তম প্রভাবশালী অংশটিকে পারস্পরিক স্বার্থসূত্রে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার পরে, ঔপনিবেশিক শাসকরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে নারীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে আরও প্রান্তিক করে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করে।

এই পরিস্থিতিতে হ্যালহেডের *A Code of Gentoo Laws*-এর ২০ বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকরা দ্বিতীয় একটি আইন তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করে। দ্বিতীয় আইনটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হিন্দু বা মুসলমান প্রজাদের ন্যায়বিচার দেওয়ার বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। বরং এই ২০ বছরের মধ্যে তারা প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থায় যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং সেই পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জগতে যে বিপুল রদবদল ঘটে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই ছিল এই নতুন আইন প্রবর্তনের একমাত্র প্রেরণা।

কোম্পানির শাসকবর্গের এই মনোভাবকে আইনের মাধ্যমে প্রতিফলিত করার জন্য, হেস্টিংসের আমলে ১৭৮১ সালে পাস হয় নতুন আইন 'The Act of Settlement'। এই আইনের ১৭ সংখ্যক ধারায় বলা হয়:

> সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও জমির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এবং দু-পক্ষের মধ্যে চুক্তি ও লেনদেনের সমস্ত বিষয়, মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমান আইন ও ব্যবহার এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন ও ব্যবহার দ্বারা নির্ধারিত হবে।

প্রধানত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টিই যে এই আইন প্রবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আইনের এই ধারাটি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটলমেন্ট অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরে, ১৭৮৩-র ২৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পিউনি জজ (puisne judge) হিসাবে কলকাতায় পদার্পণ করেন উইলিয়াম জোন্স। তাঁর ওপরই অর্পিত হয় হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি নতুন আইন বানানোর দায়িত্ব। আর জোন্সও শাসকের বাঞ্ছিত আইন প্রণয়নের কাজে আদাজল খেয়ে লেগে পড়েন।

দায়িত্ব পেয়েই তাঁর পূর্বসুরী হ্যালহেডের আইনটির অনুবাদের বিষয়ে নানাবিধ

ত্রুটি আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন জোন্স। তাঁর অনূদিত *মনুসংহিতা*-র ভূমিকায় তিনি লেখেন, এই নতুন আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হল যাবতীয় 'natural defects in the old jurisprudence of this country'-কে বিদায় করে তাকে 'accommodate it justly to the improvements of a commercial age' করা। তবে হ্যালহেডও যেহেতু শাসক পক্ষের লোক, সেহেতু আগের আইনটির যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতির দায়ভার তিনি ফারসি অনুবাদকদের ওপর চাপিয়ে দেন।

১৭৮৮ সালের ১৯ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসকে লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটিতে জোন্স বলেন:

> ...যদিও হ্যালহেড বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর ভূমিকা পালন করেছিলেন, তবুও [ভাষান্তরের সময়ে] তিনি যে ফারসি অনুবাদ ব্যবহার করেন, তার সঙ্গে মূল সংস্কৃতের অনেক পার্থক্য আছে। [এই আইনে] অনেকগুলি প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও [মূল] পাঠ্যটি ব্যাখ্যা করা বা উন্নত করার জন্য নিরর্থকভাবে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে।

চিঠিটির এই অংশ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, হ্যালহেডের আইনটিতে মূল সংকলন গ্রন্থ থেকে অনুবাদের সময়ে প্রচুর সংযোজন-বিয়োজন ঘটে। এই ত্রুটির জন্য জোন্স যতই ফারসি অনুবাদকদের দায়ী করুন না কেন, শাসকের গোপন মনোভাব আর গোপন থাকে না।

নতুন আইনটি চালু করার ক্ষেত্রে শাসকের মূল উদ্দেশ্য ছিল - ক) নারীদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সমাজে তাঁদের ব্রাত্য ও প্রান্তিক করে দেওয়া ও খ) তাঁদের জীবনধারণের জন্য কেবল পুরুষদের কৃপার ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। তাই অত্যন্ত পরিকল্পিভাবে জোন্স তাঁর আইনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসাবে নারীদের চূড়ান্ত অবমাননাকারী পিতৃতান্ত্রিক মনুকে বেছে নেন। মনুকে কেবল 'son or grandson of BRAHMA' বলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না জোন্স, বরং *মনুসংহিতা*-কে আপামর হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য, তাঁকে চিহ্নিত করেন 'not the oldest only, but the holiest of legislators' রূপেও। *মনুসংহিতা* নারীদের সম্পর্কে এত পরস্পরবিরোধী ও অশ্লীল উক্তিতে ভর্তি, যা থেকে সহজেই বোঝা যায় সমাজকর্তারা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে এই ধর্মশাস্ত্রটিতে প্রচুর সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়েছিলেন। এত বিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে নারীদের জন্য যে সামান্য অধিকারটুকু বজায় ছিল, তাকেও সমূলে উৎপাটিত করতে উদ্যোগী হন জোন্স।

হিন্দু আইনের সংকলন গ্রন্থটির জন্য জোন্স অনুবাদক ও লিপিকর হিসাবে কাদের নিযুক্ত করেছিলেন, ১৭৮৮ সালের ১৩ এপ্রিল লর্ড কর্নওয়ালিসকে লেখা জোন্সের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি থেকে সে বিষয়ে বিশদে জানা যায়। সেই চিঠিতে কর্নওয়ালিসকে জোন্স জানান, হিন্দু আইনের জন্য তিনি বাংলার পণ্ডিত রাধাকান্ত শর্মা ও বিহারের পণ্ডিত সবুর তিওয়ারি এবং লিপিকররূপে মহতাব রায়কে নির্বাচিত

করেছেন। আসলে জোন্সের মূল পরিকল্পনা ছিল, মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের জন্য দুটি আলাদা সংকলন গ্রন্থ তৈরি করা। সেই অনুযায়ী সবুর তিওয়ারি (পাঠান্তরে সর্বরী ত্রিবেদী) ১৭৮৯ সালে *বিবাদসারার্ণব* নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয়নি, অনূদিত হয়নি এমনকি কখনও সুপ্রিম কাউন্সিলে পাঠানোও হয়নি। ইতিমধ্যে ১৭৮৮-র অগস্ট মাসে একটি নতুন সংকলন গ্রন্থের জন্য জোন্স ত্রিবেণীর কিংবদন্তি সংস্কৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অবশেষে ওই বছরের ২২ অগস্ট, কর্নওয়ালিসের অনুমতিক্রমে মাসিক ৩০০ টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে নিযুক্ত করেন জোন্স।

এই গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পরে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলন গ্রন্থটিতে হিন্দুদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্মবেত্তাদের মতামত উদ্ধৃত করেন। অবশেষে তাঁর সহকারীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায়, প্রায় চার বছর (১৭৮৮-১৭৯২) অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে তিনি প্রণয়ন করেন হিন্দু আইনের সংকলন *বিবাদভঙ্গার্ণব*। কিন্তু গ্রন্থটির অনুবাদ শেষ করার আগেই ১৭৯৪ সালের ২৭ এপ্রিল জোন্স মারা যান। তাঁর অবর্তমানে গভর্নর জেনারেল জন শোরের নির্দেশে হেনরি কোলব্রুক ১৭৯৬-এর ডিসেম্বরে সংকলন গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৭৯৭ সালে অনুবাদটি *A Digest of Hindu Law on Contracts and Successions* শিরোনামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে, এই সংস্কৃত গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময়ে মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোন অংশটিতে জোন্স অতিরিক্ত নিজস্ব ব্যাখ্যা সংযোজন করেন, তা আমরা পরবর্তী আলোচনাতে দেখতে পাব।

মহিলাদের ক্ষেত্রে জোন্সের এহেন পক্ষপাতমূলক আচরণেরও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বর্তমান। ব্রিটিশ শাসকদের দ্বিতীয় আইনটি চালু করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এ কথা ঠিক, জোন্সের এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক দায়ভার বহন করার সরকারি অনুমতি দেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তবে যে সময়ে এই অনুবাদকর্মটি সমাপ্ত হয় (ডিসেম্বর ১৭৯৬), তত দিনে ভারতবর্ষের তৃতীয় গভর্নর জেনারেল জন শোর প্রশাসনিক ক্ষমতায় এসে গেছেন। এমনকি গভর্নর জেনারেল হওয়ার আগেও তাঁর মনোভাব যে এ বিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের থেকে আলাদা কিছু ছিল না, তারও একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায়।

সম্পত্তি পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের অযোগ্য মনে করে শোর তাদের 'passive instruments' রূপে সংজ্ঞায়িত করেন এবং মহিলাদের পরিবর্তে কোনও পুরুষ কর্মচারী বা মহিলাদের পুরুষ আত্মীয়স্বজনদের সেই দায়িত্ব পালনের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে লেখেন:

> আমি মহিলা জমিদারদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করব, যা তাদের [সম্পত্তি] পরিচালনার বিরুদ্ধে আপত্তিগুলিকে শক্তিশালী করে সম্ভবত একটি নিয়মের প্রয়োজনীয়তার পরামর্শ

> দেবে এবং তারা [রাজস্ব] সংগ্রহের বিষয়ে অক্ষম বলে ঘোষণা করবে। ...তারা তাদের কর্মচারীদের কাছে নিছকই নিষ্ক্রিয় যন্ত্র মাত্র এবং তাদের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপিত করা হলেও [তারা] অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেনদেন সম্পর্কে অজ্ঞ।

এ প্রসঙ্গে জন শোর মনুর বিখ্যাত শ্লোক 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে'-এর উল্লেখ করে নারীদের সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে মহিলা জমিদারদের 'disqualified from management and interference in the collections' বলে ঘোষণা করেন।

হেস্টিংস, হ্যালহেড, কর্নওয়ালিস ও জন শোরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জোন্স তাঁর অনুবাদের একটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হ্যালহেডের রেখে যাওয়া ফাঁকটিকে পুরোপুরি ভরাট করে দেন। *মনুসংহিতা*-য় লিখিত আছে:

> ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
> ভজেরন্ পৈতৃকং রিকথ্মনীশাস্তে হি জীবতোঃ।। ৯. ১০৪
>
> পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃগণ মিলিত হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করবে; কারণ, তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রগণ [সম্পত্তির] অধিকারী নয়।

অথচ এই শ্লোকটির অনুবাদের সময়ে জোন্স অতিরিক্ত ভাষ্য হিসাবে সংযোজন করেন, *'unless the father chooses to distribute it'*। [নজরটান জোন্সের] যদিও পিতা তাঁর সম্পত্তির পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দটি কীভাবে - মৌখিক না লিখিত - ব্যক্ত করবেন, সে বিষয়ে আইনে ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনও স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। অতঃপর এই আইনি ফাঁকের সাহায্য নিয়ে, পিতার মৃত্যুর পরে বিধবা স্ত্রীকে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাঁর জীবদ্দশাতেই পুত্ররা নিজেদের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা করতে শুরু করে।

এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটির ফলে যেমন বিধবা স্ত্রীকে তাঁর জীবদ্দশাতেই স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তেমনই অবিবাহিতা কন্যাদেরও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। নবম অধ্যায়ের অন্য একটি শ্লোকে এ বিষয়ে মনু বলেন:

> স্বেভ্যো[হং]শেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
> স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ।। ৯. ১১৮

ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই শ্লোকটির দীর্ঘ ব্যাখ্যা করে একদম শেষ বাক্যে জানিয়েছেন:

> ...পিতার মরণোত্তর পুত্রের ন্যায় অবিবাহিতা কন্যারাও অংশিনী হইবে এবং বিবাহব্যয়ের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা কন্যারা পাইবে, এরূপ অংশ ভগিনীদিগকে না দিলে পতিত হয়।

কিন্তু জোন্সের অনুবাদের 'সৌজন্যে' অবিবাহিতা কন্যারাও এ বিষয়ে যাবতীয় অধিকার হারাতে বাধ্য হন।

এইভাবে একে একে দায়ভাগের অনুল্লেখ, বিধবা স্ত্রীর জীবিত অবস্থায় সন্তানদের পিতৃসম্পত্তির বিলিবন্টন, স্ত্রীধনের বিলোপসাধন পর্বের একদম শেষ পর্যায়ে বিধবা স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যাদের সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারের প্রসঙ্গটিকে পুরোপুরি খতম করে দেন জোন্স। *মনুসংহিতা* ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রকে নিছক আত্মরক্ষার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে নারীদের ওপর নিজস্ব ভাষ্যের তলোয়ারটি সুনিপুণ হস্তে চালনা করেন তিনি, অথচ কোথাও রক্তপাতের সামান্যতম চিহ্নটুকুও দেখা যায় না।

[পাঠকদের সুবিধার্থে মূল সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তুটি সহজে বোঝার জন্য হ্যালহেড ও জোন্সের তৈরি ঔপনিবেশিক হিন্দু আইনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও আলোচিত হল। মূলত পাঠকদের কথা মাথায় রেখেই সাক্ষাৎকারের বহু জায়গায় আমরা আমাদের বহু জানা বিষয় সম্পর্কেও নন্দিনীদির কাছে প্রশ্ন রেখেছি, যাতে আইনের মারপ্যাঁচ সম্পর্কে কোনও ভাবেই কোথাও কোনও ফাঁক না থেকে যায়। সাক্ষাৎকারটিতে কোথাও কোথাও ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সচরাচর তার অর্থ আলাদা করে উল্লিখিত হয়নি। তবে যে সব জায়গায় আমাদের মনে হয়েছে যে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজনের প্রয়োজন আছে, সে সব ক্ষেত্রে তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে কিংবা পাদটীকা অংশে সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে।]

নন্দিনী - আমার খুব ভালো লাগছে আমরা তিনজন একসঙ্গে একটা আলোচনায় বসতে পারলাম। বিশ্বেন্দু আছে, আমার মেয়ে (অহনা পাণ্ডা) বলছিল তোমার কথা। দেবোত্তম তো আছেই। অত্রির সঙ্গে পরিচয় হল। বিশ্বেন্দু তো উপনিবেশ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

বিশ্বেন্দু - আমার বিনয়ী হওয়ার কারণ নেই, আমরা অনেক দিন থেকেই কিছু কিছু টুকরো টাকরা কাজ করেছি— বাংলায় কারিগর, হকার, চাষি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে উপনিবেশ, তার চলন দেখা এবং তার সঙ্গে কর্পোরেট বিরোধিতার আলোচনা হয়তো আমরাই শুরু করি। দেবোত্তমও সমান্তরালভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন রায়ের সমকাল নিয়ে বই লিখেছেন, আপনি বিদ্যাসাগরের বই উদ্বোধনে এসেছিলেন। তার পরে রামমোহনের সময় নিয়ে বই লিখে উপনিবেশ নির্মোক করার পথভাঙ্গা কাজ করেছেন তিনি। অত্রি এই ধারার নতুন প্রজন্মের গবেষক। সেও তার মতো করে গবেষণা করার চেষ্টা করছে।

এতদিনের উপনিবেশ-কর্পোরেট বিরোধী আলোচনা, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির পরেও আমাদের মনে হয়েছে ১৭৫৭-র পলাশী কাণ্ড থেকে ১৮২০ সাল, অর্থাৎ রামমোহন যখন কলকাতায় বৌদ্ধিকভাবে সক্রিয় হচ্ছেন, সেই সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সামাজিক অর্থনৈতিক কৃষ্টির ইতিহাস প্রায় নেই বললেই চলে। আরও বড় নেই-এর তালিকায় জুড়বে এই সময়ে বঙ্গ মহিলাদের ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ইতিহাস। আমাদের সৌভাগ্য, বঙ্গ মহিলাদের ক্ষমতা হারানোর আইনি দিকটা চিহ্নিত করার নির্দিষ্ট কাজ আপনার গবেষণায় উঠে এসেছে। আপনার গবেষণা দিশা দেখানোর কাজ। এতে আমরা খুবই আলোকিত হয়েছি। নতুন একটা ধারণা তৈরি হল। এর আগে বার্নাড কোহন বা পিটার মার্শাল বা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বা আরও দু-চারজন তাঁদের মতো করে আলোচনা করেছেন। সময়টা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ হল এই সময়ে তাত্ত্বিক পরিবর্তন আসছে— বিশেষ করে অক্ষর কৃষ্টির মানুষেরা— ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যদের মতো সবর্ণরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অভয়হস্ত মাথায় নিয়ে হাতে ছোটলোকদের মাথা কাটার অবাধ ক্ষমতা

ভোগ করছেন। ভদ্রবিত্ত পুরুষদের ক্ষমতায়নের ফলে বাংলার মেয়েদের হাতে যতটুকু ক্ষমতাও ছিল, চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমরা দেবোত্তমের কাজে দুই অঙ্কের মহিলা জমিদারদের সক্রিয়তার উল্লেখ পাচ্ছি।

নন্দিনী - তার থেকেও বেশি, জমিদার বলে নয়, আমি যা দেখেছি— আমি সব কিছু তো বইতে জুড়তে পারিনি— কৃষ্ণনগর বা অন্য মফঃস্বলের দেওয়ানি এবং অন্য আদালতের সম্পত্তির মালিকদের তালিকা দেখেছি, ফিমেল প্রোপ্রাইটর্স— সেই মহিলারা জমিদার নয়— তাদের হয়ত ছোট সম্পত্তি, কিন্তু তারা সম্পত্তির অধিকারিণী। উপনিবেশ তাদের স্রেফ নেই করে দিল।

বিশ্বেন্দু - আমি কয়েক মাস আগে আকবর আওরঙ্গজেব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু ফারসি ইতিহাস— যে সব ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে— পড়ছিলাম। জেরেট যে আইনইআকবরির সংস্করণ অনুবাদ করছেন, তাতে দেখছি— এটা আমার নজরে এনেছেন সোমনাথ রায়— মুঘল আমলে বঙ্গ মহিলারা কাছারিতে সশরীরে রাজস্ব জমা করছে। বঙ্গ মুঘল-নবাবি ইতিহাস পাঠে আমাদের ধারণা তৈরি হয়েছিল, রাজস্ব দেওয়া সম্পূর্ণ পুরুষালি কাজ। আমরা ধরেই নিয়েছি, সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক ছিল, ফলে এই ধরণের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কাজগুলো মূলত পুরুষেরাই নিয়ন্ত্রণ/সমাধা করত। মেয়েরা তো ঘরের মধ্যেই থাকে। ভিক্টোরিয় মানসিকতার জেরেট এই তথ্যটা অবাস্তব বলে অস্বীকার করে পাদটীকা দিচ্ছেন।[১]

আবুলফজলের বয়ানে বাংলার মহিলারা যখন নিজেদের হাতে কাছারিতে রাজস্ব জমা দিচ্ছেন, সেটা ১৫৯০-এর দশক, আকবরনামার প্রথম সম্পাদনা শেষ হয়। ঠিক এর ৩০০ বছরের মধ্যে মহিলাদের অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সাদা শাসক আর বাঙালি কাবাব (কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য) ভদ্রবিত্ত। ১৮৭৬-এ বাকরগঞ্জ সমীক্ষার সময় হেনরি বেভারিজ বলছেন, ভদ্রবিত্ত পরিবারের মহিলারা অচেনা মানুষের সামনে বার হয় না, যাতে তাদের দেখা না যায় সেজন্য তারা বাড়ির পিছনের অংশে অন্তঃপুরে থাকে।[২] এই ধরণের ছোট-ছোট তথ্য ইতিহাসে আলগোছে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোকে আমরা হয় আলোচনা করিনি, না হলে মান্যতা দিইনি। তাই আমরা মনে করি, এই বিষয় নিয়ে কাজের প্রচুর সুযোগ আছে। আমি যেহেতু কারিগর সংগঠনের সঙ্গে জুড়ে আছি, দেখেছি কারিগর উৎপাদন ব্যবস্থায় মেয়েদের বিশাল ভূমিকা।

নন্দিনী - দেবোত্তম - আপনার [নন্দিনী] বইতে আপনি রঘুনন্দনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন সেখানে শাস্ত্রের তুলনায় লোকাচার বেশি গুরুত্ব পেত। বিশ্বেন্দুদা আছেন, এই বিষয়ে তাঁর সামনে খুব কিছু বলা... যেমন রাণী ভবানী। রমেশ দত্তের বইতে দেখা যাচ্ছে, বাংলার যে তিনজন জমিদার কোম্পানিকে

সবথেকে বেশি রাজস্ব দিচ্ছেন, যার পরিমাণ হল বছরে সাড়ে সাত লক্ষ পাউন্ড, মানে সে সময়ের হিসেবে ৭৫ লক্ষ টাকা, তাদের একজন হলেন রাণী ভবানী। বছরে সাড়ে তিন লক্ষ পাউন্ড রাজস্ব দিচ্ছেন বর্ধমান রাজপরিবারের রাণী বিষ্ণুকুমারী। তারপরে দেড় লক্ষ পাউন্ড দিচ্ছেন দিনাজপুরের রাণী [বিশ্বেন্দু - আজকের দিনে হয়তো হাজার কোটি টাকা বা তারও বেশি] যখন তাঁরা এই পরিমাণ খাজনা দিচ্ছেন, জমিদারি এস্টেট সামলাচ্ছেন, সেই সময় থেকে মহিলাদের ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন করে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে [বিশ্বেন্দু - মহিলাদের পাবলিক স্পেস ম্যানেজ করার ভূমিকা থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে]। হ্যাঁ। তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সতীদাহের দিকে। আমাদের ডিসকোর্স হল, ব্রিটিশ-পূর্ব সময়ে বাংলায় মহিলাদের কেবল সম্পত্তির অধিকারই ছিল না, তাঁরা রীতিমতো সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটা সম্পন্ন করতেন- অথচ ইতিহাসে, সাহিত্যে সেই ডিসকোর্সটা প্রধান আলোচ্য হচ্ছে না...।

নন্দিনী - পাল্টা ডিসকোর্স, সেকেন্ড গভর্নর জেনারেল জন শোরের মত হল— ফার্মিঙ্গারের ফিফথ রিপোর্টে বলা হচ্ছে, [দেবোত্তম - ডিসকোয়ালিফায়েড ল্যান্ডহোল্ডার্স...] শুধু ডিসকোয়ালিফায়েড ল্যান্ডহোল্ডার্স বলা হচ্ছে না, মেয়েদের সঙ্গে তো লাঠালাঠি করা যাবে না, তাই মেয়েদেরকে সরিয়ে দাও, নাহলে পুরুষদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। পুরুষদের হাতে ক্ষমতা না গেলে সমস্যা দেখা দেবে। গবেষণা শেষ করে চলে এসেছি। তারপরে যখন আমি গিয়েছি, আমি ওটা মাইক্রোফিল্ম করে নিয়ে এসেছি। আমি যে কী কষ্ট করে নিয়ে এসেছি আমি জানি। আমার কাছে আছে। আমি কিচ্ছু করতে পারিনি।

বিশ্বেন্দু - আনিসুজ্জামান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠিগুলোর বাংলা রেকর্ড খুঁজতে গিয়ে[৩] বলছেন, অগ্রিম বা দাদন নেওয়ার জন্যে তাঁতিদের কারাবন্দি করে পিটানো হয়েছে। বহু আড়ং যৌথভাবে অগ্রিম না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কারণ কাপড় পিছু তাদের ঠিকমত দাম দেওয়া হচ্ছিল না। কোম্পানি আড়ং-এর তাঁতিদের তাদের শর্তে স্বাক্ষর করাতে না পারলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে, কারারুদ্ধ করে কিংবা পিটিয়ে মেরে কোম্পানির পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করত। ১৭৬০-৬৪তে যে জামদানির দাম ছিল ৫০ টাকা, ১৮০০ সালে তার দাম কমে হল ৩৪ টাকা ৪০ পয়সা। ১৮২০-তে যে ঢাকা আড়ং জনশূন্য হয়ে যাবে, তার মুখড়া চলছিল ১৭৯০-এর আগে থেকেই। আনিসুজ্জামান জানাচ্ছেন, তাঁতি কারিগরেরা কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।[৪]

১৭৭০-এর গণহত্যার লাগোয়া সময়ে ১৭৭৬ সালে শুধু ঢাকায় ৮০,০০০ মহিলার কাটা সুতোয় ২৫,০০০ তাঁতি তাঁত চালাতেন, উৎপন্ন হত

১,৮০,০০০০ গজ কাপড়। ১৭৯২ থেকে ১৮০০, এই ৯ বছরের কুঠিয়ালদের চিঠিপত্র থেকে ঢাকা ফ্যাক্টরির কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন টেলর ঢাকা আর ঢাকা আড়ং থেকে মাইলে দূরত্ব নির্ণয় করে যে কটা আড়ং-এর নাম উল্লেখ করেছেন— সোনারগাঁও (২১.৫), ধামরাল (২৮), চাঁদপুর (৩৯), নারায়ণপুর (৪৪), তিতবাড়ি (৫০), শ্রীরামপুর (৫৪.৫), বাজিতপুর (৯০) ও জঙ্গলবাড়ি (১০৬)।[৫]

এই পুঁজিবাদী অত্যাচারের সঙ্গে নবাবি মুঘল আমলের তুলনা করুন। সে সময়ে তাঁরা যে কোনও চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকারী ছিলেন। পলাশীর পরে বাংলার কারিগরেরা উচ্ছন্নে গেল।[৬] অর্থাৎ পলাশী লুঠ, যাকে ব্রুকস এডামস দ্য ল অব সিভিলাইজেশন এন্ড ডিকে - এন এসে অন হিস্টোরি বইতে পলাশী প্লান্ডার আখ্যা দিচ্ছেন— সেই লুঠ সম্পদ ব্যবহার করে ১৭৮০-তে ইংল্যান্ডে যখন কারখানা স্থাপন হচ্ছে, তার পরের বছরগুলোতে দ্রুত হারে ব্রিটেনে বাংলার কাপড় আমদানি কমেছে। শুধু ঢাকা আড়ং থেকে রপ্তানি ১৭৮৭ সালে ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৯৭-তে ১৪ লক্ষ টাকা হয়ে ১৮০৭-এ ৮ লক্ষ টাকা এবং ১৮১৩-য় ৩ লক্ষ টাকায় নেমে আসছে। এবং ১৮২০-তে ঢাকা জনশূন্য হয়ে যাবে। বাংলায় পলাশীর পরে যে বিশিল্পায়ন চলছিল, সেটা ১৭৯৩-এ পুরোদমে শুরু হয়ে ১৮২০-তে সম্পূর্ণ হবে।

আনিসুজ্জামান লন্ডনে ব্রিটিশ কুঠির যে নথি করেছিলেন সেখান থেকে ইন্টারেস্টিং তথ্য পাচ্ছি, ১৭৮৭ অবধি রফতানি বেড়েছে, তারপর দ্রুত কমেছে। এটা স্বেন বেকার্ট, সুশীল চৌধুরী, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, আবদুল করিমের লেখাতেও পাচ্ছি। যে সব ইতিহাসকার বলেন মিলের চাপে বাংলার হাতে তৈরি তাঁত উঠে গেল, তাদের ওপর শাসক কোম্পানি কী ধরণের হিংসা চাপিয়েছিল, তার প্রমাণ আনিসুজ্জামানের গবেষণায় বলা আছে।[৭] আমরা কী করতে পারব জানি না, কিন্তু পলাশী থেকে ১৮২০— এই ৬০-৭০ বছরের সময়কে ধরতে হবে। এই সময়ে অন্তত ৩ কোটি বই দেশের বাইরে চলে গেছে।[৮]

নন্দিনী - আরও একটা জায়গায় আছে— প্যারিসে— কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা সেখানে একবার না একবার ঘুরে আসে। সব্যসাচী ভট্টাচার্য আর ফ্রাঁস ভট্টাচার্য আমায় নিয়ে গেলেন। বিবলিওথেক রিশ্যলুতে চন্দননগর থেকে ওরা সমস্ত কিছু নিয়ে গেছে। কালিকামঙ্গলের হাজার কয়েক এডিশন আছে। আমি ওখানে ১৫ দিন ছিলাম। আরও যে কী ওখানে আছে আমরা জানি না। আমি তো এই কাজে যাইনি। জানি না কী কী আছে সেখানে।

বিশ্বেন্দু - যদুনাথ সরকার প্যারিস থেকেই শিতাব খান বা মির্জা নাথানের লেখা

'বাহারিস্তানইগায়েবি' আবিষ্কার করেন। আমার মনে হয় এই সময় নিয়ে কাজকর্ম করা দরকার। বীণা তলোয়ার 'ডাউরি মার্ডার'-এ বলছেন, কীভাবে ফেমিনিন ইকনমি ম্যাস্কুলিন হচ্ছে (ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জীর Monastic Governmentality, Colonial Misogyny, and Postcolonial Amnesia in South Asia প্রবন্ধটা তখনও পড়ি নি)। নীলাদ্রি ভট্টাচার্য 'গ্রেট এগরারিয়ান কনকুয়েস্ট'-এও প্রায় কাছাকাছি কথা বলছেন। পাঞ্জাবের প্রেক্ষিতে কাজ আছে, কিন্তু বাংলার প্রেক্ষিতে নেই। ধরে নেওয়া হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে বাংলা— বিখ্যাত বিখ্যাত ইতিহাসকার, সমাজতাত্ত্বিক, যাঁরা নবাবি আমল নিয়েও কাজ করেছেন, এই সময়টাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

আপনার কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ থাকল। কারণ আপনি যে কাজটা করেছেন, সেটা আমাদের এই সময়কে বুঝতে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। [দেবোত্তম - আমরা একটা কাউন্টার ন্যারেটিভ পেয়েছি।] ঢাকায় ৮০ হাজার মেয়ে ১৭৭৬-এ সুতো কাটছে, ২৫ হাজার তাঁতি তাঁত চালাচ্ছেন। এবং এটা ঘটছে ছিয়াত্তরের দুর্বিপাকের পরের সময়েও। তার কিছুটা আগে বাংলায় ১ কোটি মানুষ মারা যাচ্ছেন, অর্থাৎ ১৭৫৭-য় বিপুল মহিলা সুতো কাটতেন। ১৮২৮-এর *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকায় যদি শান্তিপুরের চরকা কাটনি চিঠিতে তাঁর সেই স্বচ্ছলতার কথা লিখতে পারেন, তাহলে পলাশীর আগের আড়ংগুলোয় মহিলাদের কী ধরণের স্বচ্ছলতা ছিল, সে কথা কি আমাদের ভেবে দেখা দরকার নয়? সীমিত হলেও সম্পত্তির অধিকার থাকা তো কম কথা নয়। [নন্দিনী - তাদের অর্জিত অধিকার। তারা হারিয়ে ফেলল] একদম, বিশেষ করে সবর্ণ পরিবারের মেয়েরা। বাংলার ইতিহাসের একটা অচর্চিত সময় বুঝতে আপনার বইটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কিন্তু এই বইটার উপাত্ত, সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে আমরা আরেকটু এগোতে পারি। আপনি যে জোনসের ডায়রির কথা বলছেন। জোনস সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাটবল্টু হয়ে বাঙালি ভদ্রবিত্তকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পুনর্বাসনে সাহায্য করবেন।

দেবোত্তম - দিদির বইতে আরেকটা ডায়েরির উল্লেখ আছে, জাস্টিস হাইডের ডায়েরি। [নন্দিনী - এর কপিটা ভিক্টোরিয়াতে আছে]। ১৭৭৬-এ জেন্টু ল কোডটা তৈরি হল। ১৭৯৬ পর্যন্ত এই আইন বিষয়ে সকলের জ্ঞান ছিল না। বিভিন্ন ডিসপিউট হচ্ছে। যেমন শ্বাশুড়ি-বৌমার মধ্যে মামলা হচ্ছে। শ্বাশুড়ি মনে করছেন তিনি সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু বৌমা মনে করছে আমার স্বামী যেহেতু সম্পত্তির অধিকারী ছিল, তাই আমি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করব।

বিশ্বেন্দু - আমাদের কেস ল নির্ভর আইন ছিল না, অর্থাৎ পূর্ববর্তী রায়ের অনুসারে রায় দেওয়া হত না। আমাদের এখানে অন্যরকমভাবে বিবাদগুলোর নিস্পত্তি

ঘটত। ব্রিটিশ কেস ল[৯] নির্ভর করে আইন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হল ১৮২০-৩০-এর দিকে। এই যে আইনি পরিবর্তন ঘটছে, সে সব আমাদের সমাজ জীবনে বিপুল প্রভাব ছেড়ে যাচ্ছে। এই সিস্টেম থেকে, এই আলোচনা থেকে মেয়েরা বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

নন্দিনী - আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই। বর্ধমানে একটা কলেজ আমায় ডেকেছিল। সেখানে সুশীল (চৌধুরী) বাবু গিয়েছিলেন। ওরা আমায় প্লেনারি সেসানে বক্তৃতা দিতে ডেকেছিল। সেখানে আমি ধরে ধরে দেখিয়েছিলাম যে এইটিন্থ সেঞ্চুরি ডার্ক এজ নয়- না সামাজিকভাবে, না মহিলাদের দিক থেকে, না অর্থনৈতিকভাবে। আমি বাংলায় লিখেছিলাম। ওরা ছাপিয়েছিল। আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি। ব্রিটিশরা নিজেদের শাসন পোক্ত করার জন্যে এই ভাষ্যটা তৈরি করেছিল। সেভেন্টিন্থ সেঞ্চুরির শেষ থেকে ওরা বাংলাকে অন্ধকার যুগ হিসেবে দেখানোর উদ্যম নেয়।

দেবোত্তম - আমরা আপনার বই সংক্রান্ত আলোচনায় ঢুকি। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বইটি ইংরেজিতে লেখা। সে বই যে সবাই পড়েছেন, এমন তো নয়। কিন্তু সেই তথ্য সকলকে জানানো দরকার। তাই আমরা একটা প্রশ্নমালা তৈরি করেছি- তার উত্তর যাতে জনগণের কাছে পৌঁছে যায়, সেটা আমরা দেখব। আমার প্রশ্নের পরে বিশ্বেন্দুদা-অত্রি সামাজিক দিকগুলো নিয়ে কথা বলবেন। আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি বইটার নাম দিচ্ছেন 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যান্ড ইনভেনশন'। এখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অর্থে খাবলা মেরে মেরে নেওয়া এবং তাকেই একটা নতুন রূপ দেওয়া- এই বিষয় নিয়ে কাজ করার ভাবনাটা আপনার মাথায় কী ভাবে আসল? সেটা কি মহিলাদের ক্ষমতা যাচ্ছে, আপনি মহিলা হিসেবে সেটা দেখছেন, না কি আরও অন্য বিষয় আছে?

নন্দিনী - আমি ট্রান্সপারেন্ট মানুষ। বিয়ের পরে আমি বর্ধমানে গিয়েছিলাম ছ'মাসের জন্যে। ফেলোশিপটা আমায় দীপ্তেন ব্যানার্জী দিয়েছিলেন। উনি তারপরে অক্সফোর্ডে স্কলারশিপ নিয়ে চলে গেলেন। আমার রেজাল্ট খুব ভালো হয়নি, আমার মা খুবই অসুস্থ ছিলেন, আর আমার বাপের বাড়ির পরিস্থিতিও খুবই ঝামেলার ছিল। আমি যখন এম এ পড়ি, গৌতম ভদ্র আমায় প্রপার্টি নিয়ে লিখতে দিয়েছিলেন, আমি খুবই রিসার্চ করে লিখেছিলাম। কাজটা করতে খুবই ভালো লেগেছিল। তাছাড়া আমি সংস্কৃতটা জানি। আমি ভটচাজ বাড়ির মেয়ে, আমি সংস্কৃত কলেজে পাণিনী পড়তে গিয়েছিলাম, আমার ঠাকুর্দা, বাবা অন্যরকম চাকরি করলেও সংস্কৃতটা জানতেন। [বিশ্বেন্দু - বাড়িতে চর্চা ছিল।] হ্যাঁ, ছিল। বিয়ের পরে সংস্কৃত কলেজে পাণিনী পড়তে গেলাম।

তারপরে যখন আমি অক্সফোর্ডে গেলাম, তখন আমি তপনদাকে [রায়চৌধুরী]

বললাম আমি বিমল [কৃষ্ণ] মতিলালের কাছে পড়তে চাই। তপনদা খুবই অহংকারী মানুষ ছিলেন। তপনদা যখন মারা গেলেন, তখন উনি আমার ফাদার, আমার ফ্রেন্ড, আমার ফিলোজফার, আমার শিক্ষক তো বটেই। অনেকের জীবনের শুরুটা সব সময় ভালো হয় না— আমারও হয় নি। উনি বললেন, তুমি তো কনভেন্ট স্কুলে পড়োনি, তুমি ইংরেজি ঠিক লেখ, কিন্তু ইংরেজদের মত লেখো না। তারপর বিমল মতিলালের কাছে গেলাম। উনি অসম্ভব ভালো স্কলার। উনিও কনভেন্টের ছাত্র নন। আমার প্রতি ওঁর মমতা জন্মে গেল। তখন অক্সফোর্ডে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, নন্দিনী ইংরেজিটা জানুক ছাই না জানুক, নন্দিনীর মাথায় বুদ্ধি আছে। আমি কিন্তু কোনও স্কলারশিপ নিয়ে যাইনি। উনি ওনার স্কলার ফান্ড থেকে একটা টাকা জোগাড় করে দিলেন— পরবর্তী কালে তো অবশ্য আমায় প্রচুর ফান্ডিং দেওয়া হয়েছিল

তারপরে শুরু করলাম, জিমূতবাহনকে নিয়ে কাজ। কিন্তু তাঁর বিষয়ে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য নেই। আমি দুজনকে বললাম জিমূতবাহন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য কোথায়? এই সময়কার সাহিত্য তেমন কিছু নেই। আমি কাজ করবটা কী করে? আমি তখন খুব ঝামেলার মধ্যে রয়েছি। ওখানে একটা খুব বড় সেমিনার হওয়ার কথা। এখানকার বিগ বসেরা গেলেন— বরুণ দে, বিপান চন্দ্র, গায়ত্রী স্পিভাক, আমার হাজব্যান্ড চিত্তরঞ্জন পাণ্ডা— ও জেএনইউর নামকরা ছাত্র ছিল, হিতেশ [রঞ্জন সান্যাল]দাও গিয়েছিলেন। আরও কে কে সব গিয়েছিলেন মনে নেই। সে যাই হোক, ওঁরা আমার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করতেন। আমি রান্নাটা ভালো করতাম, রান্না করতে ভালোও লাগত।

একদিন অক্সফোর্ডে হিতেশদার সঙ্গে হাঁটছি। হিতেশদা মানুষটা খুবই ভালো ছিলেন। আমি হিতেশদাকে জিজ্ঞেস করলাম, বুঝতে পারছি না, প্রপার্টির ওপরে কীভাবে শুরু করব। উনি বললেন, নন্দিনী, তুমি হ্যালহেড'এর কোডটা ভালো করে পড়ে দেখ। তুমি কিন্তু এখান থেকেই কাজটা শুরু করতে পার। তুমি দেখ তো কীভাবে ব্রিটিশেরা আইনি দৃষ্টিতে সম্পত্তিকে দেখেছে। উনি আমার সামনে বন্ধ দরজা খুলে দিলেন। সেই থেকে আমার কাজ শুরু হল; অক্সফোর্ডে তো সব আছে, এভরিথিং। এই কাজটা করতে করতে পড়লাম উইলিয়াম জোনসের বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু। এইভাবে করতে করতে এক বছরের মধ্যে [বিশ্বেন্দু - ৮৫-র আশেপাশে...?] হ্যাঁ তাইই হবে, একটা কাঠামো খাড়া করে দিলাম। আমার মাথায় ছিল ইভলিউশন অব দ্য প্রপার্টি রাইটস। ইভলিউশন খোঁজ করতে করতে আমি কলকাতায় কাজ শুরু করলাম... এশিয়াটিক সোসাইটি সমস্ত কিছু আকর আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। ওরা আমায় তুলোট কাগজে বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু অরিজনাল আর

দুটোই তুলে দিলেন।

হ্যালহেড কোডের ট্রান্সলেশন আমায় দিয়েছিলেন নীরদ সি চৌধুরী। আমায় খুবই ভালোবাসতেন। ওঁর অনেক বইতে আমার রেফারেন্স আছে, আর *আত্মঘাতী বাঙালি*তে আমায় অ্যাকনলেজও করা আছে। এগুলো পড়ছি ঠিকই, বোঝারও চেষ্টা করছি... কিন্তু এগুলো তো সোজা বিষয় নয়, তখন নথি বার করা বলতে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (অধুনা লাইব্রেরি) খুঁজে খুঁজে প্রচুর উপনিবেশিক নথি পড়েছি, [বার করেছি...] কীই না করেছি তখন। শেষ পর্যন্ত আমি মোটামুটি একটা কাঠামো খাড়া করলাম।

বিমলদা আমায় গোটা বিবাদভঙ্গার্ণবসেতু নিজের হাতে নোট করে দিয়েছিলেন... সেটা এখনও আমার কাছে আছে। সেই কাজটা হয়ে গেল। তারপরে বিমলদার ক্যান্সার ধরা পড়ল। বিমলদা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। ওঁর মেয়ে দেখাশোনা করত। আমি তাঁর বাড়ির উল্টো দিকে থাকতাম। সেই অসুস্থতার মধ্যে একদিন উনি আমায় ফোন করে বললেন চলে এসো, আমি এখন বেটার ফিল করছি। সে দিনটা আমি কোনও দিনই ভুলব না। উনি আমায় পড়াতে শুরু করলেন। উনি বিছানা থেকে একটু উঠে বসার চেষ্টা করতেই দুটো হাড় ভেঙে গেল। কি যন্ত্রণা! তিনি সেই যে হাসপাতালে গেলেন, আর ফিরলেন না। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মারা গেলেন, কি যে কষ্ট পেয়েছি আমরা সে দিন! এ দিকে আমি তখন সাংঘাতিক বিপদে পড়লাম। কারন বিবাদভঙ্গার্ণব... ভীষণ শক্ত টেক্সট।

এই টেক্সটগুলো ছিল না। বিবাদার্ণবসেতুই হোক বা বিবাদভঙ্গার্ণবই হোক, দুটোই কোড— তৈরি করা। আমাদের এখানে কোডের ধারণা ছিল না। যেমন দায়ভাগ— বিবাহ হলে বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত হলে প্রায়শ্চিত্ত, মিক্সড ব্যাগ ছিল না। এটা তো ব্রিটিশরা তৈরি করল। যাই হোক, কী আর করব, [বিমলদা মারা যাওয়ার পরে] দেশে ফিরে এলাম। তখনও আমি জানি না আমি কী করব, কীভাবে এগোব।

এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি পাঁচিল থেকে পড়ে যাচ্ছি আর বিমলদা আমার হাত ধরে তুলে ধরে বলছেন তুমি পারবে, তুমি ঠিক পারবে। আমি উঠে পড়লাম। ইট ইজ সো সিম্বলিক। আমি ভেবে নিলাম আমিই পারব, আমাকেই পারতে হবে। ডিকশনারি হাতে নিয়ে আর বিমলদার নোট সম্বল করে বিবাদভঙ্গার্ণবটা নতুন করে পড়তে শুরু করলাম। এবং সেই পাঠেই আমি সব উদ্ধার করতে পারলাম। উনি তো আমায় ন্যায় শিখিয়েছেন। কেন যে আমি ভয় পেয়েছিলাম জানি না। যে সব জায়গা আমি পড়তে পারলাম না, সে সব অংশ নিয়ে আমি কিছু কিছু মানুষের কাছে গেলাম। তাঁরা কিছু

কিছু অংশের নামে বলে দিলেন। আর এখানকার যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ, তাঁরা শুধুই সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ, ট্রাডিশনাল। ইতিহাসের সঙ্গে তাঁরা কমপ্লিট ডিট্যাচড। এরা এটাকে টেক্সট হিসেবে দেখে। এই বই-এর যে একটা বিশাল ঐতিহাসিক কনটেক্সট আছে, সেটা এখানকার অধিকাংশ সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ জানেনও না, বোঝেনও না, ভাবেনও না।

আবার ফেরত গেলাম অক্সফোর্ডে। সেখানে গিয়ে পুরোটা লিখলাম। লিখতে গিয়ে হঠাৎই বুঝতে পারলাম, মূল ব্যাপারটা— আরে! এটা তো ইভলিউশন নয়, এটা তো ইনোভেশন! তখন আমার থিসিসটা জমা দিতে এক মাস বাকি আর তপনদার মেয়ের বিয়ে। তপনদা বললেন, তুমি দিয়ে দাও, তুমি ফেল করবে না। বলো কাদের কাদের তুমি রাখবে। ক্রিস বেইলি তাঁর খুবই পছন্দের মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমার আপত্তি ছিল। খুবই ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। টেরেন্স উইলিয়ামের কথা বললাম। ওখানে একটা প্রেজেন্টেশনে টেরেন্স আমায় প্রচণ্ড প্রশংসা করলেন। আমার পরীক্ষা হল। এছাড়া ছিলেন ওয়ার্নার মেনস্কি।

বিশ্বেন্দু - রিচার্ড ঈটন বলছেন মুঘল আমলে পূর্ববঙ্গে জঙ্গল হাসিল করে বসতি তৈরি হচ্ছে, পাট্টা দিচ্ছে, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে মাইগ্রেসন হচ্ছে। এই সময়টা ইন্টারেস্টিং। [নন্দিনী - এই সময়টা নিয়ে কিছুই প্রায় কাজ নেই]। না নেই। খুব স্ট্রে কাজ আছে, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু সেভেন্টিন্থ সেঞ্চুরি এইটিন্থ সেঞ্চুরি, বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের মারা যাওয়ার পর থেকে উপনিবেশে সংহত হওয়ার ১০০ বছর প্রায়, যখন লর্ড লেক দিল্লিতে বাহিনী নিয়ে ঢুকে বলছেন আলেকজান্ডারের অনারব্ধ কাজ আমি সম্পূর্ণ করলাম— তিনি যে কাজ পারেননি, সে কাজ আমি শেষ করলাম। এই যে সময়টা— বাংলায় ব্রিটিশেরা আছে, কিন্তু ভারতজুড়ে তো ব্রিটিশ নেই। ব্রিটিশেরা সাম্রাজ্য তৈরি করছে আমাদের বাংলা লুঠের সম্পদে। কলোনিয়াল স্টেট তৈরি হওয়ার সময়, প্রক্রিয়া, তত্ত্ব...

দেবোত্তম - বিশেষ করে আপনি বলছেন এইটিনথ সেঞ্চুরি... নবজাগরণের বিরোধী কাজটা... নবজাগরণ তো অষ্টাদশ শতকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, ডার্ক এজ আছে বলেই ব্রিটিশেরা বলছে আমরা ভারতকে উন্নত করার চেষ্টা করছি, সেই কাউন্টার ডিসকোর্সে আপনার কাজটা খুবই জরুরি একটা মাইলস্টোন।

নন্দিনী - আমি যখন কাজ করছি, দেখেছি, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বাংলা বা চন্দনগরের ওপর প্রচুর ডকুমেন্ট আছে। কিন্তু আমার দরকার হয়নি। হাইড পেপার তো ১৭০০ সামথিং-এ শুরু হচ্ছে, তখন আমরা দেখতে পাব, ঐ সমাজটাই কীভাবে আস্তে আস্তে ভাঙছে।

বিশ্বেন্দু - আমাদের এখানে জ্ঞানচুরি একটা বড় গল্প... রেনেলের বইতে দেখছি। শুধু সম্পদ লুঠ নয়, জ্ঞান লুঠও বড় গল্প মানে কীভাবে আমাদের জ্ঞান, আমাদের প্রযুক্তি ইওরোপে শিল্পবিপ্লবে সহায়তা করছে। এবং এর কোনও সূত্র রাখা হচ্ছে না। একমাত্র রেনেল বইতে বলছেন, তিনি মুঘল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। তিনি যে মাপছেন, জরিপ করছেন, সেটা আদতে মুঘল কাঠামো। যে জারব দণ্ড নিয়ে তিনি জমি মাপছেন এবং যারা তাঁকে সাহায্য করছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মুঘল আমলের পেশাদার। নবাবি আমল তো মুঘল আমলের এক্সটেনশন। আমরা রেনেলের কাজ বরাবরই ইন্ডিপেন্ডেন্ট জ্ঞানচর্চা হিসেবে দেখেছি। আমরা ধরে নিয়েছি, এ দেশি মানুষজনকে ব্রিটিশেরা জরিপের জ্ঞান শেখালেন। কিন্তু জরিপ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে— সুলতানি আমল থেকে নবাবি আমল পর্যন্ত যত জরিপ হয়েছে তার রেকর্ড আছে। এ সব ব্রিটিশ আসার আগের সময়ে। অথচ আমরা ধরে নিচ্ছি ব্রিটিশেরা জরিপের জ্ঞান নিয়ে আসছেন, আমরা সেই জ্ঞান থেকে আলোকিত হচ্ছি। এই প্রশ্নগুলো এই সময়ে তোলা দরকার আছে। কিংবা ধরুন, ১৭০৭-এ আর্করাইট যান্ত্রিক মাকু তৈরি করছেন। কিন্তু বাংলা থেকে যতক্ষণ না ইংলন্ডে মাকু আর তার সঙ্গে গবেষণা করার জন্যে, আর ভর্তুকিতে কারখানা তৈরি করার জন্যে বিপুল সম্পদ গিয়েছে, ততদিন আর্করাইটের এই প্রযুক্তি পড়ে ছিল, কাজে লাগে নি। এই যে নলেজ, সুতো কাটার দক্ষতা তৈরি করা নলেজ... ২৫০-৩০০ রকম কাপড় তৈরি হচ্ছে, তার রং, প্রত্যেকটা কাপড়ে একের বেশি আকারের ব্যবহার হওয়া সুতো, সুতোগুলোর ওজন। কাপড় তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে মহিলাদের হাতে সুতো কাটার মধ্যে দিয়ে। ঐতিহাসিকেরা গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁতিদের, অথচ যে কাপড় তৈরি হচ্ছে, সেই কাপড় তৈরির পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি নির্দিষ্ট আকারের সুতো মহিলারা কেটে না দিতেন, আর রঞ্জকেরা নির্দিষ্ট কোড অনুযায়ী রং না করতেন, তাহলে তাঁতিদের কীই বা করার ছিল? তাঁতিরা তো সুতোও কাটেন না, সুতো রঙও করেন না। আস্তে আস্তে মেয়েদের হাত থেকে কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ১৭৮০-তে ইংল্যান্ডে প্রথম সুতোর কারখানা তৈরি হচ্ছে, সে সুতো আসছে বাজারে, মেয়েদের হাত থেকে কাজ চলে যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে তুলোর চাষ প্রায় হয় না বললেই চলে, অথচ ইংল্যান্ডে সব থেকে বেশি তুলোর কারখানা। আমাদের দেশে মেয়েদের হাত থেকে সম্পত্তি চলে যাচ্ছে, মেয়েদের হাত থেকে রোজগার চলে যাচ্ছে, মেয়েদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাচ্ছে- এই ইতিহাসটাই নেই। আমাদের ইতিহাসে বলা হচ্ছে ব্রিটিশ এ দেশে এসেছে। তারা এসে মেয়েদের উদ্ধার করেছে।

নন্দিনী - পাবেন কোথা থেকে? ইতিহাস লিখেছে ব্রিটিশরা। একেবারে নেই কী না

বলতে পারব না। কিন্তু খুঁজতে হবে।

বিশ্বেন্দু - সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়ম আর মুজফফর আলমের সম্পাদনায় 'মুঘল স্টেট'-এ সম্পাদকদের মন্তব্যে দুই সম্পাদক লিখছেন, দিল্লির মহাফেজখানার নথি সূত্রে জানা যাচ্ছে আলিবর্দি বাংলার জমিদারি রিস্ট্রাকচার করছেন ১৭১৫-য়, কিন্তু ব্রিটিশ নথিতে বলা হচ্ছে ১৭২১। এবং আমরা ব্রিটিশ নথিকেই প্রামাণ্য মনে করছি। আপনি যে সময়টা নিয়ে কাজ করেছেন, সেই সময়টাকে আর্থিক, সামাজিক এবং কৃষ্টির দিক দিয়ে আমরা অন্ধকারের সময় বলতে পারি না।

নন্দিনী - কোনও এক কফি ব্যারন অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ডের ওপরে কাজ করার জন্যে আমায় পয়সা দিয়েছিলেন। সুইজারল্যান্ডে থাকেন। ক্লিভল্যান্ডের ওপর কাজ করতে গিয়ে ওল্ডহ্যাম পেলাম, ফ্রান্সিস বুকানন পেলাম [বিশ্বেন্দু - বুকাননের সমীক্ষায় অনেকগুলো দিক আছে]। বুকানন গ্রাম মানে হাতি, ঘোড়া, সাপ বা ধর্ম বলছেন না, তিনি অর্থনীতি নিয়ে লিখছেন। তিনি দেখছেন মহিলারা ক্ষেতে কাজ করছে, তার মানে এরা গরীব। এই ন্যারেটিভটা আমায় খুব ধাক্কা দিয়েছিল।

বিশ্বেন্দু - অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসন ১ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ পর্যন্ত যে জিডিপি মেপেছেন, তার বিপরীতে অমিয় বাগচী অগ্রগতি ক্যালকুলেশন করেছেন বুকাননের অর্থনৈতিক সমীক্ষার ভিত্তিতে। তিনি এই অঞ্চলের মানুষদের গালি দিয়েও ২৫ জিডিপি পরিমাপ করেছেন। অমিয়বাবু বলছেন অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসনের হাতে কোনও ডেটাই ছিল না— তাই তিনি বুকাননের সমীক্ষা ধরে উপনিবেশি অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করলেন।

নন্দিনী - আমি অবশেষে ক্লিভল্যাণ্ডের ওপর একটা মনোগ্রাফ লিখলাম। আমি তখন এশিয়ান কনফ্লুয়েন্স ডিস্টিঙ্কট ফেলো। মনোগ্রাফটা ওরা প্রকাশ করেছিল। নেহেরু মেমোরিয়াল ফেলো হিসেবে নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া নিয়ে কাজ করলাম। কাস্টম ছিল, ল হল। কাস্টম ফ্লেক্সিবল, কাস্টম ইভলভিং। এটা রিটন নয়। আর ল তো ল। ল তো পিউনিটিভ (শাস্তিদায়ী)। তাহলে কী করে কাস্টমগুলো ল [তে রূপান্তরিত] হল? এর জন্যে ব্রিটিশদের বিপুল ভায়োলেন্স তৈরি করতে হয়েছে। নর্থ-ইস্টের সমস্ত জায়গায় তাই করেছে— যেমন নাগাল্যান্ডে।

বিশ্বেন্দু - সুশীলবাবু, ওমপ্রকাশ বা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ অনেক রিপোর্ট নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁদের কাজের ম্যান্ডেট আছে। বাংলার কাপড় নিয়ে এদের তিনজনেরই কাজ আছে। আমার উৎসাহ বাংলাতেই। জাহাজে যখন পণ্যগুলো উঠছে, তার যে ইনভয়েস তৈরি হচ্ছে, সেই ইনভয়েস উল্লেখ যখন গবেষকেরা করছেন তাতে কাপড় আর কয়েকটা পণ্য লিখে তারপর ইত্যাদি বলছেন। অথচ অন্য সূত্রে পাচ্ছি বিশাল বিশাল ফার্নিচার যাচ্ছে, যার উল্লেখ

সুশীলবাবু বা ওমপ্রকাশ বা নরেনবাবুর লেখায় পাই না। আমাদের এক বন্ধু আছে মহুয়া লাহিড়ি, ও ফ্যাশান কর্পোরেটের কাজ করত। ও ইওরোপে ঘুরে দেখেছে, মিউজিয়ামগুলোয় বাংলার কাঁথা টাল দিয়ে রাখা আছে। আমরা এবারে [২০২৩ বইমেলায়] একটা বই প্রকাশ করেছি 'সপ্তগ্রাম', সেখানে লেখক বলছেন, ভাস্কো যখন আফ্রিকার মেলিন্দ উপকূল হয়ে ভারতে আসছেন এবং সেখানে তিনি পথ হারিয়েছেন। তখন মেলিন্দের রাজা তাঁকে বাংলার কাঁথা উপহার দিলেন। তখনও ইওরোপীয়রা ভারতে পা দেয় নি। ওটা কুইল্ট- কাঁথা না-ও হতে পারে— বেডস্প্রেডও হতে পারে। বাংলার মেয়েদের এই উৎপাদন দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে গেছে এবং তার প্রভাব এত যে, সে পণ্য রাজা বিদেশিকে উপহার হিসেবে দিচ্ছেন। ১৭০০-র মাঝামাঝি মেয়েদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে না হলে তোমাদের সতী করে দেব। অথচ ১৪৯০-এর দশকে, তার ২০০ বছর আগে বাংলার মেয়েদের কাঁথা আফ্রিকায় পৌঁছে যাচ্ছে। এই সময়ের ইতিহাস নেই।

নন্দিনী - নেই তো, একেবারেই নেই।

বিশ্বেন্দু - আপনার কাছে অনুরোধ থাকল, আমরা কী করতে পারব জানি না, কিন্তু বাংলার মেয়েদের নামে প্রচুর গালি দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশেরা না এলে মেয়েরা মুক্তি পেত না...।

নন্দিনী - আমি এটা সব সময় কন্টেস্ট করি, দেবোত্তম এই কাজ করেছে, আমি লিখেছি। অক্সফোর্ডের এক কলেজে আমায় পয়সাকড়ি দিয়ে নিয়ে গেল, তারপর আমি ২০ মিনিট ধরে এই বক্তৃতা করলাম, সকলে গম্ভীর হয়ে শুনল। তপনদার বাড়িতে ছিলাম, তপনদাকে বললাম মেয়েদের নিয়ে এ সব 'ভুলভাল' কথা কী করেই বা ওরা সহ্য করে! তারপরে আর ডাকলই না।

বিশ্বেন্দু - আমরা কী করতে পারব জানি না। কিন্তু আপনি এই ব্যতিক্রমী কাজ করেছেন। হ্যালহেডের কোড বিশ্লেষণ করে যে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, এ কথা আপনার আগে কেউ বলে নি। হ্যালহেড নিয়ে বাংলায় প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এমনকি হ্যালহেড উচ্চারণ হবে না কি হ্যালেদ উচ্চারণ হবে— এই নিয়েও ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে।

দেবোত্তম - হ্যালহেডের ব্যাকরণ নিয়ে কথা হয়েছে। বিদ্যাসাগর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ লিখছেন, উনি ৭ বছর বাংলা শিখেছেন। ৭ বছর বাংলা শিখে তিনি ব্যাকরণ লিখছেন ইংরেজিতে! বাঙালিরা প্রশ্ন করিনি, ক্লাস সেভেনের বাংলা পাঠের বিদ্যে নিয়ে হ্যালহেড কীভাবে বাংলা ব্যাকরণ বই লেখার যোগ্যতা অর্জন করল! আমরা যদি হ্যালহেডকে ছেড়েও দিই, উইলিয়াম কেরি ১৭৯৩-এ আসছেন, জাহাজে তিনি বাংলা শেখা শুরু করছেন, তাঁর বাংলা

ব্যাকরণ বই বেরোচ্ছে ১৮০১-এ। ৮ বছরের মধ্যে তিনি বাংলা ব্যাকরণ বই লেখার জায়গায় চলে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের এখানে যাঁরা বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস লিখেছেন, তারা এই নিয়ে কোনও দিন প্রশ্ন অবধি করেননি।

নন্দিনী - আমার এখানে ব্যকরণ বইএর রাজনীতি নিয়ে বক্তব্য আছে। ব্রিটিশ এ দেশে আসার পরে প্রত্যেককে একটা করে ব্যাকরণ করে দিল। বাংলা ব্যাকরণ তো হলই, তারপর হিন্দি, আমি তো অনেক দিন দার্জিলিং সিকিম নিয়ে কাজ করেছি, আমি লেপচা নিয়ে অনেক কাজ করেছি, লেপচা কমিউনিটি নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছি। সেটা বেশ দেশ বিদেশে ছড়িয়েছে। লিম্বুদের ব্যাকরণ যেটা তৈরি হল, সেটা শুনলে হাসবে। লিম্বুদের অক্ষর তৈরি হয়ে গেল। সেখানে কিছু বাক্য তৈরি হয়ে গেল। সেই বইটার নাম দেওয়া হল লিম্বু গ্রামার।

বিশ্বেন্দু - আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে— যে সব সিভিলিয়ান বাংলায় সংস্কৃত নিয়ে কাজ করলেন, তাঁরা সংস্কৃত শিখলেন কোথায়? ম্যাক্সমুলার যখন ঋগ্বেদ অনুবাদ করছেন তখন তিনি ২ বছর সংস্কৃত শিখেছেন। বাংলায় যে ইওরোপিয় পণ্ডিতরা এসেছেন, তাঁরা কোথায় সংস্কৃত শিখেছেন? সংস্কৃতের লিপি না থাকলেও তার ব্যাকরণ আছে। সংস্কৃত শিখতে গেলে গুরু লাগে— কারণ কোনও জনসমষ্টিই সংস্কৃত ভাষায় দৈনন্দিনের আলাপচারিতা করে না। কথ্য ভাষা নয়, ইওরোপে যে সংস্কৃত শিখছে— নাহয় ধরে নিলাম জার্মানিতে সংস্কৃত শেখার একটা ফেন্ট কাঠামো তৈরি ছিল। কিন্তু যাঁরা লন্ডনে শিখছেন, তাঁদের শিক্ষক কে? জোনস কোথা থেকে সংস্কৃত শিখেছেন? বাংলায় এসে শিখছেন।

নন্দিনী - জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে কয়েক বছর শিখেই তিনি বিবাদভঙ্গার্ণবের কাঠামো তৈরি করলেন?

বিশ্বেন্দু - যাঁরা তাঁদের নিয়ে আলোচনা করছেন, তাঁরা সকলেই ধরে নিচ্ছেন এঁরা সংস্কৃত পণ্ডিত।

দেবোত্তম - সম্ভবত ১৭৮৪-তে এশিয়াটিক সোসাইটি তৈরি হল। ১৭৮৬-তে জোনস যখন সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন গ্রিকের তুলনা করছেন, তখন তাঁর সংস্কৃত শেখার বয়স ১ বছর। [নন্দিনী - উনি ১ বছরই শিখছেন, তার বেশি কিন্তু তিনি শেখেননি, তার পর তিনি লিখতে শুরু করেছেন]। তিনি ব্রাহ্মণ পেলেন না, নবদ্বীপে গেলেন, সেখানেও ব্রাহ্মণ পেলেন না, একজন বৈদ্যকে পেলেন, সংস্কৃত মাত্র ১ বছর শিখলেন এবং ১ বছরের শিক্ষায় তিনি সংস্কৃতর সঙ্গে ল্যাটিন গ্রিকের তুলনার তাত্ত্বিক অবস্থানে চলে যাচ্ছেন। এটা নিয়ে আজ অবধি কেউ কেন প্রশ্ন করলেন না? আমার কথা হল হ্যালহেডের বাংলা

ব্যাকরণের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার বইতে দেখলাম তার কোড অব জেন্টু ল'ও আছে। সেটা যে আছে, আপনার বই পড়ার আগে তার ধারণাই ছিল না। এটা তো অন্য কোনও জায়গা থেকে আবিষ্কার হল না। রামমোহন বিদ্যাসাগর নিয়ে প্রভূত বই হয়েছে। সে সব বইয়ের লেখকরা তো এই আইন দুটো যে ছিল, সেটা কোথাও বললেন না।

নন্দিনী - অথচ এটাকে বেস করে কোর্টে জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছে। রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ করলেন, তিনি একবারও হ্যালহেড কোডস কোথাও দেখেছেন, এটা দেখলাম না। ডিউটি বাউন্ড ফেথফুল উইডো তো সতী হবেই।

দেবোত্তম - রামমোহনের সংস্কৃত জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, বেদান্তও অনুবাদ করছেন। ইনহেরিটেন্স বা মহিলাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া নিয়ে ওঁর পুস্তিকা আছে। সেখানে কিন্তু উনি জোনসের মনুসংহিতা-র সূত্র দিচ্ছেন। রেফারেন্স উনি *মনুসংহিতার* দিতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেখানে জোনসের অনুবাদ দিচ্ছেন। তিনি নিজেই মূল মনুসংহিতার উদাহরণ বা তার অনুবাদ দিতেই পারতেন, তাঁর সেই ক্ষমতা ছিল— সেই সময়ে তাঁর সেই ক্ষমতা চলে এসেছে।

নন্দিনী - আমি নিজে জোনসের অনুবাদটা তুলনা করে দেখিয়েছি জোনসের ইন্সটিটিউট অব হিন্দু ল'তে অ্যাকচুয়াল মনুস্মৃতিতে যে মানেটা হয়, জোনস সেটা কিছুটা বদলেছিলেন। স্মৃতি মানে 'ল' নয়। কিন্তু জোনস মনুসংহিতা অনুবাদ কতে নাম রাখলেন ইন্সটিটিউট অব হিন্দু ল। তিনটে আলাদা বিষয়— যাতে করে মা আর সম্পত্তির অধিকার না পায়, মায়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। আমার বইতে সেটা আছে।

দেবোত্তম - এই যে এতগুলো জায়গায় কিন্ত পণ্ডিতেরা জোনসের হিন্দু ল, হ্যালহেডের হিন্দু ল বা কেরি বা হ্যালহেডের বাংলা জানা নিয়ে বিন্দুমাত্রও প্রশ্ন তুললেন না। এখন আমরা এভারেস্টের ঘটনাটা জানি যে রাধানাথ শিকদার পর্বত মেপেছিলেন, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, নাম হয়েছিল কর্তা এভারেস্টের। বাংলা বা সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এ সব বিষয় নজর দেন বলে মনে হয় না।

নন্দিনী - সংস্কৃত জানা মানুষজন ইতিহাস বা চলতি সামাজিক ইস্যু বিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না।

দেবোত্তম - আমি ধরে নিলাম, সংস্কৃতজ্ঞরা মাথা ঘামাবেন না, কিন্তু ইংরেজিতে রামমোহনের সতীদাহ বিষয়ক দুটো ট্রিটাইজ রয়েছে। তার প্রথমটায় বলছেন রঘুনন্দন, জিমূতবাহন এবং শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার— এঁরা মহিলাদের আগের সময়ের অধিকার খর্ব করেছেন, ক্ষতি করেছেন, ফলে মহিলাদের সতী হতে

হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, আরেকটা ট্রিটাইজে উনি যাদের আগে নিন্দা করেছেন, আপনি [নন্দিনী] যে নিয়মটা দেখিয়েছেন, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ে আমাদের এখানে যেটা চলত...

নন্দিনী - একে বলে উপাবমসত্ত্বভাদ, মারা যাবার পরে উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি লাভ করে।

দেবোত্তম - তাতে উনি খুব খুশি। তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এগুলো কি ইচ্ছাকৃত না কি অনিচ্ছাকৃত?

নন্দিনী - জানি না, রামমোহনকে বুঝতে পারি না। বিদ্যাসাগরের কাজকর্ম আমি অতটা পড়িনি। বিদ্যাসাগরের দয়ামায়া নিয়ে অনেক গল্প আছে। ভালো। উনি দয়ালু মানুষ ছিলেন। কিন্তু মেয়েরা কি কারোর দয়ার প্রত্যাশী?

দেবোত্তম - দারুণ বলেছেন।

নন্দিনী - বিদ্যাসাগরকে দয়া করতে হবে কেন? উনি তো শেষমেশ দয়াই করলেন বাংলার মেয়েদের। আহা গো, অবলা নারী। বিয়ে ছাড়া মেয়েদের আর কোনও জীবনের গতি নেই। বইতে এর বেশি আমার বলা সম্ভব হল না।

দেবোত্তম - আমাদের অনেকেরই না জানা, অজানা বিষয়, ব্রিটিশ-পূর্ব সময়ে কী অভিন্ন দেওয়ানি আইন ছিল? পলাশীর পূর্বে যতক্ষণ না কলোনিয়াল হিন্দু আইন তৈরি হচ্ছে, তার আগে দেশজুড়ে কী অভিন্ন দেওয়ানি আইন ছিল? অভিন্ন ফৌজদারি আইন ছিল আমরা জানি। কিন্তু দেওয়ানি আইন কী অভিন্ন ছিল?

নন্দিনী - না। আমি যতদূর পড়েছি, গ্রামে আরবিট্রেশনের মতো হত। জমিদার, পণ্ডিতরা থাকতেন [দেবোত্তম - সালিশি]। হ্যাঁ। এবং সেখানে কিছু আলোচনা হত। এ ধরণের কাজকর্ম আমরা পঞ্চানন মণ্ডলের চিঠিপত্র সংকলনে পাচ্ছি। এটা খুব ইনফরমাল লেভেলে বিচার করা হত। অর্থাৎ স্মল কনসিকুয়েন্সেস— প্রপার্টি বা ফ্যামিলি ম্যাটারগুলো। যদি বড় সমস্যা হত, তাহলে জমিদারের কাছে যেত। সেখানে পণ্ডিতদের তর্ক হত— জাজ হিসেবে জমিদার বা বুজুর্গরা থাকতেন— তাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে এমন কোনও শর্ত ছিল না। রঘুনন্দনের ভাষায় প্রাড়বিবাক এই বিচারের দায় নিতেন। এটা না হলে তখন কাজির বিচার।

দেবোত্তম - কাজির বিচারে মুসলমানেদের জন্যে আলাদা, হিন্দুদের জন্যে আলাদা [আইন] ছিল? না কি সবারই জন্যে এক ছিল?

নন্দিনী - হিন্দুদের বিচারের জন্যে পণ্ডিতদের সাহায্য নেওয়া হত। কিন্তু মাথায় রাখতে

হবে, কাজির বিচার ছিল অন দ্য কমন সেন্স, এবং অন দ্য কাস্টম অব দ্য ল্যান্ড। অঞ্চলে অঞ্চলে প্রথা পাল্টাত। যে অঞ্চলে যে প্রথা মান্য, সেই প্রথা অনুযায়ী বিচার হত। মহম্মদ রেজা খান পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন। ফলে অভিন্ন দেওয়ানি আইন বলে কিছু ছিল না।

দেবোত্তম - এই যে বর্তমান সময়ে ইউনিফর্ম সিভিল কোড-এর কথা শুনছি, এবং সেই দিকেই যাচ্ছি— এই ব্যাপারটা ভারতবর্ষে কোনও কালেই ছিল না। আপনার বইতে জানতে পারছি, অন্য জায়গায় মিতাক্ষরা থাকলেও তার চারটে স্কুল বা আঙ্গিক ছিল। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্যে সে সব আঙ্গিক প্রযুক্ত হত। মিথিলার জন্যে এক রকম, দক্ষিণ ভারতের জন্যে আরেক রকম ইত্যাদি। এই যে অঞ্চলভেদের বৈচিত্র— সেটা খুব জরুরি ছিল। ইউনিফর্মিটি ছিল না। আরেকটা কথা আপনি বললেন, কাজির বিচার। আমাদের এখানে বাগধারায় যে কোনও কারণেই হোক, কাজির বিচারকে তুচ্ছার্থে দেখা হয়। কাজির বিচার যেন স্বৈরতান্ত্রিক, ইচ্ছামাফিক। এটা কি কলোনিয়াল কারণে, না কি সত্যি সত্যিই কাজির দরবারে ঝামেলাদার বিচার হত?

নন্দিনী - না আমি এইরকমের কোনও উদাহরণ পাইনি। কাজির সম্মান নষ্ট করা হল উপনিবেশে এসে। কাজির বিচার দেওয়ানি না ফৌজদারি কোন ক্ষেত্রে বিচার করা হয়েছে, সেটা বিবেচ্য।

বিশ্বেন্দু - হত্যার বিচার, বড় ফৌজদারির বিচার একমাত্র রাজধানীতে হত। যদুনাথ সরকার স্পষ্টভাবে বলছেন, এই বিচার রাজধানীতে হত। যদুনাথ কিন্তু ব্রিটিশ কাঠামোকেই সর্বোত্তম মনে করতেন। উনি বলছেন, তার বাইরে রাষ্ট্রের আইনের হাত পৌঁছত না— অরাজক অবস্থা ছিল।

দেবোত্তম - কলোনিয়াল দেওয়ানি আইন হল, হিন্দুদের জন্যে আলাদা, মুসলমানদের জন্যে আলাদা। আর ফৌজদারি হল অভিন্ন। কলোনিয়াল পিরিয়ডের আগে কি হিন্দু ল বলে কিছু ছিল?

নন্দিনী - হিন্দু ল কথাটাই নতুন। হিন্দু ল বলে কোনও ব্যাপার ছিল না। অনেস্টলি, অমুসলিম বোঝাতে হিন্দু শব্দ ব্যবহারই হয়নি।

বিশ্বেন্দু - তখন কী বলা হত? একটা তো নাম থাকবে।

দেবোত্তম - যারা হিন্দু, তাদের ক্ষেত্রে তত্ত্বসভা টাইপের কিছু বসছে, শাস্ত্রীয় বিচার চলছে। দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে মুসলমান সম্পত্তি ইত্যাদির বিচার হলে কী হত?

নন্দিনী - তাদের কাজি বা মৌলভি বিচার করত।

দেবোত্তম - আপনার বইতে কলোনিয়াল হিন্দু ল তৈরি হওয়ার আগে আপনি যে ৫ জন ব্রিটিশ আডমিনিস্ট্রেটরের কথা বলেছেন, যার মধ্যে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ- স্ক্রাফটন, হলওয়েল এবং আলেকজান্ডার ডাও। হিন্দুদেরর ধর্মশাস্ত্র, কোনও কালেই আইন হিসেবে গণ্য হত না, তাকে আপনি বারবার কোড অব কন্ডাক্ট বলছেন। এই ধর্মগ্রন্থকে আইনে রূপান্তরিত করাটা কি অজ্ঞতাবশত না কি ইচ্ছাকৃত?

নন্দিনী - ডেরেট বলেছেন এটা অজ্ঞতা। আমি বলছি, এটা মেডিজি। এত কাস্টম তারা বুঝতেও পারত না। এত বড় জায়গা, নদিয়াতে এক ধরণের কাস্টম তো বর্ধমানে আরেক রকম— ওরা তো বুঝতে পারছে না, বিচারের প্রশাসন কীভাবে চালাবে? এই সব কিছুকে বুঝে উঠতেই ওদের একশো বছর কেটে গিয়েছিল।

দেবোত্তম - এই যে ধর্মশাস্ত্রের উচ্চারণ স্ক্রাফটন, হলওয়েল, ডাও বারবার করছেন, এটা কি হেস্টিংসকে কোনও ভাবে প্রভাবিত করেছিল? কারণ ১৭৮২-তে যে অ্যাক্ট অব সেটলমেন্ট তৈরি হচ্ছে, সেখানে হেস্টিংস ধর্মশাস্ত্রকে আইনে রূপান্তরিত করলেন।

নন্দিনী - উইলিয়াম জোনস ইন্সটিটিউ অব হিন্দু ল'তে লিখেছেন। হলওয়েল শাস্ত্র বলতে পারছে না, বলছে সাস্তা। ডাওকে তো ফিজিওক্রাটিক বলেছেন রণজিৎ গুহ, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না, রণজিৎ নমস্য ব্যক্তি। এটা ফিজিওক্রাটিক ডক্ট্রিন হিসেবে এ সব হয় নি, এটা কিন্তু সত্যি কথা। লুক স্ক্রাফটন, হ্যারি ভেরেলস্ট— এরা খুঁজে বার-টার করেছে, এরা ব্যবস্থা দেখে-টেখে হয়তো ভেবেছে হিন্দুরা হিন্দুদের মতো চলে। কিন্তু মনুস্মৃতিই হোক বা অন্য স্মৃতিশাস্ত্র, তাই দিয়ে পণ্ডিতেরা বিধান দিতেন না। তাঁদের বিধান ছিল পিওর এন্ড সিম্পল আর্বিট্রেশন (সালিশি বা মধ্যস্থতা)। সোজা কথা। এই বিধান কিন্তু কপিবুক দেখে দিতেন না। জমিদার বা রাজার কোর্টে গেলে বই-টই দেখার ব্যাপার আসত। তাঁরা কমন সেন্স দিয়েই পাঁতি বা ব্যবস্থা দিতেন।

বিশ্বেন্দু - বর্ণ কাঠামোর বাইরে যে বিচার ব্যবস্থা...

নন্দিনী - সেটা আরেকটা সমস্যা। যারা মুসলমান নয়, যারা জৈন নয়, যারা খ্রিষ্টান নয় তাদের ওপরে হিন্দু আইন প্রযুক্ত হল। বিপুল সেকশন অব ট্রাইবও অন্তর্ভুক্ত হয়েগেল।

দেবোত্তম - এই যে জনজাতি গোষ্ঠী, যাঁদের নিজেদের আইন কানুন ছিল, বিচার ব্যবস্থা ছিল, তাঁরা যে এই আইনের কাঠামোয় ঢুকে গেলেন, সেখানে কি তাঁরা

বিরোধিতা করেছিলেন?

নন্দিনী - আমি তো প্রচুর ট্রাইবাল এরিয়া ঘুরেছি। এদের অনেকেই হিন্দু ফোল্ডে চলে এসে গর্ব বোধ করতে লাগল। এরা কোয়াসি-পণ্ডিত গোছের কাউকে ডেকে এনে বিয়ে থা দিত। এদের এক বিখ্যাত তাত্ত্বিক, ঘুরিয়ে এদের ব্যাকওয়ার্ড হিন্দু বলেছেন। ভেরিয়ার অলউইনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যিনি অনেক যুক্তি দিয়েছিলেন।

দেবোত্তম - আপনি যেহেতু বিবাদার্ণবসেতু আর বিবাদভঙ্গার্ণব— দুটোরই ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখেছেন, সত্যিই সত্যিই কি এই গ্রন্থগুলোর অস্তিত্ব ছিল? না কি পরে এটা কোডিফায়েড হয়েছে?

নন্দিনী - বিবাদভঙ্গার্ণব লিখতে তো ১১ জন পণ্ডিতকে অ্যাপয়েন্ট করা হল। এর অতীত অস্তিত্ব ছিল না। এগুলো নতুন করে লেখা হল।

দেবোত্তম - আচ্ছা। এটা নতুন করে লেখা হল। বিবাদার্ণবসেতু বলে আদপে কোনও বই ছিল না।

নন্দিনী - না, না ছিলই না। এটা নতুন করে কম্পাইল করা হল।

দেবোত্তম - এটা তাহলে ইনভেনশন।

নন্দিনী - পণ্ডিতেরা এই ইনভেশনের জন্য মাসে ১০০ টাকা মাইনে পেত।

দেবোত্তম - এই যে বিবাদার্ণবসেতু লেখা হচ্ছে, যেহেতু আপনি এই বিষয় নিয়ে অনেকটা, অনেক কাল চর্চা করেছেন, আপনি বলেছেন, আমরা সকলেই জানি বাংলা আর অসমে দায়ভাগ চালু ছিল, বাদবাকি সমস্ত জায়গায় মিতাক্ষরা। এই আইনটা যখন কম্পাইলেশন হচ্ছে, হ্যালহেডের সংস্কৃত জ্ঞানের মাত্রা, তাঁর যে আইনের জ্ঞানের মাত্রা— সেই মাত্রা অনুযায়ী দায়ভাগ বা মিতাক্ষরা বিষয়ে তাঁর কোনও পূর্ব ধারণা কি ছিল? এমন কি কোনও সূত্র আপনি পেয়েছেন?

নন্দিনী - না। আমি জোন্সের ডায়েরিতে যা পেয়েছি, সেটা হল এরা একটা লিস্ট অব টপিকস তৈরি করত— এরা বলে দিল এই আইনে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া চলবে না। যেখানে মেয়েদের প্রপার্টির অধিকার কম, সেই আঙ্গিকের ধারাগুলো নিয়ে এসো। ফলে প্রচুর জায়গায় বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদাভঙ্গার্ণবতে আমি দেখেছি— বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে মিতাক্ষরা যেহেতু একটু রক্ষণশীল ছিল, তারা ধরে ধরে মিতাক্ষরার শ্লোকগুলো অনুবাদ করে কোডে ঢুকিয়ে দিল। [অথচ অঞ্চলটার পরম্পরা দায়ভাগ— অতীতে যেখানে মেয়েরা কিছুটা হলেও সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছেন]।

এমনকি হাইডের ডায়েরিতে লেখা আছে... মাথায় রাখতে হবে অ্যাংলো-হিন্দু জুরিসপ্রুডেন্স হাইড শুরু করেছেন। আমি অনেক অনেক কোর্ট দেখেছি, সেখানে কোর্ট পণ্ডিত বলছে দায়ভাগ বিধান অনুযায়ী, এই মহিলা একটা নির্দিষ্ট পাবে— কিন্তু ব্রিটিশ জজ না করে দিলেন। একজন মহিলা কেস করেছিলেন, আদালত বলে দিল স্বামীর বিরুদ্ধে কেস করা যাবে না। কোর্ট পণ্ডিত বলল অবশ্যই পারবে— বলেই জিমূতবাহনের ধারা তুলে ধরল। এরকম অনেকগুলো কেস রয়েছে। তখন কী করা? বেনারসে ডানকান ছিলেন। এক বছর অপেক্ষা করা হল। তিনি মিতাক্ষরার ধারায় জাজমেন্টটা দিলেন, সেটা কনজারভেটিভ জাজমেন্ট ছিল। এটাই হল অ্যাংলো-হিন্দু জুরিসপ্রুডেন্স যার ওপর হিন্দু কোড বিল, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট সব দাঁড়িয়ে আছে।

দেবোত্তম - এখনও অবদি সেটাই চলছে।

নন্দিনী - হ্যাঁ।

দেবোত্তম - মোদ্দা কথা বললে ১৭৭৬-এ যে প্রথা শুরু হল, সেটা এই ২০২৩-এও চলছে। হিন্দু কোড বিল অর্থাৎ ১৯৫৬ নাগাদ মণিকুন্তলা সেন শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে যা-তা লিখছেন, সেটাতেও আমরা ১৭৭৬-এর ছায়া দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ কোনওভাবেই বলা যাবে না, এই হিন্দু ল অনুসারে সর্বভারতীয় আইন চালু হচ্ছে বলে দায়ভাগের জায়গায় মিতাক্ষরাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা নয়, আসল টার্গেট হল মেয়েদের হাত থেকে ক্ষমতা কাড়তে গেলে যা যা দরকার সেটাই করতে হবে।[১০]

নন্দিনী - মেয়েদের ক্ষমতা কাড়ব, আমি [ব্রিটিশ শাসক] পুরুষমানুষের হাতে বড় প্রপার্টি রাখতে দেব না, ফলে বড় ভাইয়ের হাতে কিছু সম্পত্তি রেখে সব কিছু কাট করে দিলাম। আমাদের নিজেদের ট্রেডের একটা নিয়ম আছে, আমি দেশের নিয়মটাকে সেইভাবেই সাজাব। আমি শাস্ত্রের আইন মানছি— কারণ পণ্ডিতেরা সেটা লিখে দিয়েছে— তোমাকেও সেটা মানতে হবে।

দেবোত্তম - আরেকটা কথা। এই অনুবাদ প্রকল্পে যে সব বাঙালি পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা যেহেতু বেতনভুক ছিলেন, ধরে নিচ্ছি তাঁদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অনেক পরে আসছেন, তার আগের প্রকল্পতে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন। দায়ভাগের জায়গায় মহিলাদের সম্পত্তি এবং অন্য অধিকার হ্যালহেড তুলে দিচ্ছেন, অথচ প্রথাটা যে আছে, সেটা পণ্ডিতেরা ভালো করেই জানেন। এই বিষয়ের প্রতিবাদে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল?

নন্দিনী - তপনদার বক্তব্য ওরা [ব্রিটিশরা] বলেই দিত ওরা কী চাইছে। সারা পৃথিবীতে

প্রথম কোড হল হ্যালহেড কোড। নেপোলিয়ানিক কোড ১৮০৪-এ হয়েছিল। তারপর ১৮২৬-এর কোড। পণ্ডিতদের বলা হয়েছে এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থেকে এই কাজ আমাদের করে দাও। পণ্ডিতেরা চাহিদা মতো তাই করে দিয়েছেন। উইলিয়াম জোনসের ডায়েরিতে আমি দেখছি, উনি বিশদে আলোচনা করছেন। প্রশ্ন করছেন, কেন তোমরা এটা করছ, এটা কেন এরকম হবে, কেন এটা বলছ বুঝিয়ে বল ইত্যাদি।

দেবোত্তম - মিতাক্ষরা আর দায়ভাগের সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিষয় অনেকেই জানতেন না। আমরাই জানতাম না।

নন্দিনী - না না, এই পার্থক্য কিন্তু খুব একটা সূক্ষ্ম ছিল না। কারণ মিতাক্ষরা বলছে, একজন মানুষ মারা গেলে তার সম্পত্তি যদি ভাগ হয়, তাহলে তার বউ বিভাজিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে আর দায়ভাগে বলছে ডিভাইডেড বা আনডিভাইডেড প্রপার্টি যাই হোক, বিধবাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিতে হবে। মিতাক্ষরায় বলছে, চারটে ছেলে আছে আর একটা অবিবাহিতা কন্যা আছে, সেখানে কন্যার জন্যে সম্পত্তি ভাগের প্রশ্নই নেই কিন্তু দায়ভাগে বলছে কন্যাও সমান ভাগ পাবে।

দেবোত্তম - তাহলে আপনি বলছেন, পরিবারের সম্পত্তি ভাগ হোক বা না হোক, বিধবা সম্পত্তির অধিকার পাবে— এই বিধবার পুত্র সন্তান যদি থাকে, তাহলে কী সেই সম্পত্তি পুত্র সন্তানের অধিকারে যাবে? না কি বিধবার অধিকারে থাকবে?

নন্দিনী - মনুস্মৃতিতেও আছে, জিমূতবাহনেও আছে, পরিবারের কর্তা মারা গেলে ছেলেদের সঙ্গে তার মা সমান উত্তরাধিকারী হবে।

দেবোত্তম - মনু বলেছেন [নন্দিনী - জীমূতবাহনও বলেছেন]। আচ্ছা। আমি যেহেতু জিমূতবাহন খুব বেশি জানি না, মনু বলছেন পিতা এবং মাতা দুজনের মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তি ভাগ করতে পারে। [নন্দিনী - সেটা নিয়ে জোনস কনটেস্ট করছেন]। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি সেটা নিয়ে কিছু বলছি না। ধরুন স্বামী মারা গেলেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিধবা নিজে হবেন, না কি তিনি ততদিন সম্পত্তি দেখভাল করবেন যতদিন না তাঁর পুত্র সাবালক হয়?

নন্দিনী - এটা তাই। জোনস একে লিমিটেড এয়ার [উত্তরাধিকার] বলছেন। ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশনে এই কথাটা আছে। উনি লিমিটেড এয়ার ছিলেন না, উনি কাস্টডিয়ান ছিলেন, সম্পত্তিটা ওঁরই ছিল, পুত্র সাবালক হলে সম্পত্তি ওঁর আর ওঁর ছেলেরও থাকবে। সেইজন্যই তো বর্ধমান রাজবাড়ির বৌমা আর

শ্বাশুড়ির গোলমালটা হল।

দেবোত্তম - হ্যাঁ। কিন্তু আমরা কাস্টমের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে বর্ধমান রাজবাড়ির ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি— রাণী বিষ্ণুকুমারীর পুত্র তখনও বড় হয়ে ওঠে নি। সেই সময়ে রাণীই সাম্রাজ্য চালাচ্ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পরে পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে। আবার দেখছি রাণী ভবানী- তিনি এই আইনটা তৈরির আগেই— মানে হ্যালহেডের কোড অব জেন্টু ল আসার আগেই দত্তক পুত্র নিচ্ছেন, যাতে সম্পত্তিটা অন্য কারও কাছে না যায়। আমার প্রশ্ন- বিধবা আর তার পুত্র, দুজনেরই কি সমান ভাগ?

নন্দিনী - সমান ভাগ। বিষ্ণুকুমারীর ছেলে অ্যালাও করেছে। কিন্তু গোলমাল তো হতেই পারে। বা ছেলে বড় হয়ে গেলে মা বলতে পারে, তুই চালা [সম্পত্তি দেখাশনা কর]। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ছেলে মায়ের পরামর্শ নিত— এর উদাহরণ তো আমরা সেই সময়ের সাহিত্যে দেখতে পাই। আমরা মেট্রিয়ার্কি বলব না, পেট্রিয়ার্কির উল্টো উদাহরণ বলব না, কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন— কাকে কী দেওয়া হবে, কোন জমিতে কোন ধান চাষ করা হবে— ছেলে থাকলেও মহিলাদের সক্রিয় থাকার উদাহরণ আমরা কম পাই না।

দেবোত্তম - এটা আমরা রামমোহনের মায়ের ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি। আমরা দেখেছি, তাঁর পিতার তিন স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু রামমোহনের মা তারিণী দেবী সংসার চালাতেন। ইন্টারেস্টিং হল, রামমোহনের পিতা, তাঁর কিছু লিটিগেশনও ছিল, ধরাও পড়েন, তিনি কিন্তু জীবদ্দশায় উইল করে ভাগ করছেন। ভাগ করার পরে আমরা দেখছি, রামমোহনের মা পুরো সংসার চালাচ্ছেন। আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন— যদিও এটা আপনি বিশদে আলোচনা করেছেন। আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, পিতার মৃত্যুর পরে দায়ভাগ অনুসারে সম্পত্তির বিভাজন বিবাদর্ণবসেতু মেনে নিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে মিতাক্ষরাকেও মেনে নেওয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রে, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুড়ি ভাগের একভাগ... [নন্দিনী - না এটা মিতাক্ষরা নয়, এটা দায়ভাগই। একে বিংশোদ্ধার বলে।] আচ্ছা বুঝলাম। এটা দায়ভাগই। কিন্তু এটা তারা মানে নি। সমস্ত পুত্রের সম্পত্তির সমান ভাগ পাওয়ার ব্যাপারটা কি মিতাক্ষরাতেই ছিল?

নন্দিনী - হ্যাঁ। এটা শুধু দায়ভাগ বা মিতাক্ষরা নয়। হ্যাঁ, দায়ভাগে জ্যেষ্ঠর বিংশোদ্ধার তো ছিলই। এটা কাস্টম— আইন নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বড় ছেলেই পরিবার-সম্পত্তি চালাচ্ছে। ছোট ছেলেদের ভূমিকাই থাকছে না। এটা ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি নির্ভর করত। আমরা দেখেছি ইউপির বড় বড় তালুকদার, বড় ছেলে গোটা সম্পত্তি দেখশোনা করছে, ছোট ছেলে তার অধীনে আছে।

আমাদের এখানে জয়েন্ট ফ্যামিলির একটা ধারণা ছিল। ভাগাভাগি বন্ধ করা হল। কেন? ভাগাভাগি হলে পরিবারের পাওয়ার কমে যাবে, প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে। এখানেও তাই করা হল। বড় বড় ইকনমিক ইউনিট থাকা তো ব্রিটিশের পক্ষে থ্রেট হত। ফলে ওরা বড় বড় জমিদারি ভেঙে তছনছ করে দিল। এলিসন ড্যানিয়েল থর্নারের বইতে আছে কীভাবে জমিগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এটা ব্রিটিশেরা হিন্দু ল থেকেই উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে করে চলেছে।

দেবোত্তম - আপনি বলছেন, [কোম্পানির সিদ্ধান্ত ছিল] সম্পত্তি/খাজনার পরিমাণ এত লাখ টাকা হলেই ভেঙে দাও— তার নীচে হলে ভাঙব না। মানে খাজনা যদি ২ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে ভাঙব না— অতটা কড়াকড়ি করব না। কিন্তু বাকি বড় জমিদারি যে কটা আছে সেগুলোকে ভেঙে দাও।

নন্দিনী - ওরা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অব প্রপার্টি চেয়েছিল। মাঝারি আকারের প্রপার্টি হলেই ভেঙে দিত।

দেবোত্তম - আরেকটা প্রশ্ন। দায়ভাগে অপুত্রক বিধবা, স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হবে। মিতাক্ষরায় বলা হল তারা শুধু ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবে। সংকলকরা তাঁদের সংকলন গ্রন্থে এই দুটোকেই রাখছেন। কিন্তু যখন মামলা হচ্ছে তখন কি শাসকেরা নিজেদের স্বার্থ দেখছেন?

নন্দিনী - না বিবাদার্ণবসেতুতে বিধবার সম্পত্তির অধিকার রেখেছিল। কিন্তু হ্যালহেড যে কোড লেখালেন, তাতে তিনি মেয়েদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে দিলেন, আর অপুত্রক বিধবার সম্পত্তির অধিকারের ধারণাটাই তুলে দিলেন। এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে। আমার যতদূর মনে পড়ছে, কোম্পানি প্রশাসন ঠিক করল মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার তো রাখবেই না, সম্পত্তির অধিকার যদি থাকে সেটা পাবে একমাত্র দত্তক পুত্র। ওরা মেয়ে দত্তক নেওয়াতে উৎসাহ দেখাল না। পুত্রই হোক বা দত্তক পুত্রই হোক, ছেলেদের সব সম্পত্তির অধিকারী করা হচ্ছে, তাদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার একটাই উদ্দেশ্য- মেয়েরা যাতে বিন্দুমাত্রও সম্পত্তির অধিকার না পায়। মেয়েরা যাতে কোনও খাজনা না দিতে পারে। কারন ইংলন্ডে তখনও মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। তারা উপনিবেশে কেন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেবে, কেনই বা জমিদারির অধিকার দেবে। একটাই রাস্তা এই অধিকার কেড়ে নেওয়া।

দেবোত্তম -আপনি বলেছেন, বিবাদার্ণবসেতুতে দত্তক প্রথা গুরুত্ব পায় নি, অনুবাদ বইটার শেষের দিকে বিবিধ প্রসঙ্গে আছে। হ্যালহেডে কিন্তু দত্তক পুত্র সম্পত্তির অধিকার পেল।

নন্দিনী - ইংরেজি অনুবাদটা ইন্টারেস্টিংভাবে হল। অরিজিনাল থেকে কমপ্লিট

ডেভিয়েশন।

দেবোত্তম - এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললেও কম বলা হয়। [নন্দিনী - অবশ্যই]। দত্তকপুত্রের সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার প্রশ্নটা আসছে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার বিচ্যুত করতে। মূল গ্রন্থে থাকছে— কিন্তু তার যখন অনুবাদ হচ্ছে, সেখানে পালটে দেওয়া হচ্ছে। দত্তকপুত্র নিয়ে আলোচনা শেষ হয় নি। ধরা যাক রাণী ভবানীর কথা। ইনি দত্তক পুত্র নিলেন। কিন্তু মহিষাদলের রাণী জানকী দত্তক নিচ্ছেন না, অপুত্রক অবস্থাতেই জমিদারি পরিচালনা করছেন। একজন আইন হওয়ার আগে দত্তক পুত্র নিচ্ছেন, অন্যজন আইন হওয়ার পরেও দত্তক পুত্র নিচ্ছেন না। কেন?

নন্দিনী - কোম্পানির আমলারা অনেক সময় দত্তক নিতে বাধা দিত। সেখানে নিজেদের লোক বসাত। অনেক সময় জমিদারিতে বিশাল ঝামেলা হয়েছে। দত্তকই নিতে দিচ্ছে না।

দেবোত্তম - রাণী ভবানী কিন্তু দত্তক নিচ্ছেন দেবর ইত্যাদিদের হাতে সম্পত্তি যাওয়া আটকাতে।

নন্দিনী - বর্ধমানের কথা ভাবো। সকলেই প্রায় দত্তক। তিন-চারজন মহিলাকে দত্তক নিতেই দেয় নি, আমার বইতে আছে— খুঁজে দেখো। তখন ওরা ভেস্ট করে নিত আর নিজেদের লোক বসাত।

বিশ্বেন্দু - এটা কী ব্রিটিশদের মহিলাফোবিয়া?

নন্দিনী - হ্যাঁ। কেন হবে না? এইটিন্থ সেঞ্চুরি ইংল্যান্ডের কথা ভাবুন। সেখানে মেয়েরা নার্সও হতে পারত না। মেয়েদের বিয়ে করা ছাড়া অন্য কিছুই করার নেই। খুব বেশি হলে স্থানীয় অঞ্চলে ইস্কুল শিক্ষিকা। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নই নেই। এরা এত পেট্রিয়ার্কাল শভিনিস্ট ছিল!

দেবোত্তম - দত্তক নিতে দেওয়া হচ্ছে না, কোম্পানির ঘনিষ্ঠ বসানো হচ্ছে, এঁরাই কি পরবর্তীকালের দেওয়ান বেনিয়ান হলেন?

নন্দিনী - হ্যাঁ। এদের সঙ্গে কোম্পানির আমলারা সাঁট করে জমিদারিগুলো মহিলা জমিদারদের থেকে দখল নিয়েছে। প্রচুর ঘুষ হাত বদল হয়েছে।

বিশ্বেন্দু - ঠাকুর, উত্তরপাড়ার মুখার্জীরা এইভাবেই ঘুষ দিয়ে জমিদারি দখল করেছেন।

নন্দিনী - ব্রিটিশ কর্মচারীদের অনেকেই রাইটার হয়ে কলকাতায় এসে বিপুল সম্পত্তি নিয়ে দেশে ফিরে ক্যাসল বানিয়ে শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন।[১১]

দেবোত্তম - মনুস্মৃতি অনুযায়ী বাবা-মা থাকা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানেরা সম্পত্তি ভাগ করতে পারে না। অথচ হ্যালহেড অনুবাদে বললেন এই প্রথাটা যথাযথ

আর শালীন নয়। মা যদি মনে করেন, তাহলে অনুমতি দিতে পারেন। তাহলে তিনি সন্তানের থেকে একটা ভাগ পাবেন ইত্যাদি। আমার বইটার সমালোচনা করতে গিয়ে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন তুলেছেন, মিতাক্ষরা অনুযায়ী মা ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী। এই আইনটায় মা পুত্রের সঙ্গে অন্তত ১ ভাগ সম্পত্তি পেলেন। তাহলে কি নতুন আইনে নারীর ক্ষমতায়ন হল না?

নন্দিনী - ক্ষমতায়ন কীকরে হবে? আগে ছিল, মা মারা না গেলে সম্পত্তি ভাগ হবে না। হ্যালহেড বললেন প্রথাটা বাজে। তিনি আইন করে ছেলেদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। মেয়েদের ক্ষমতায়ন হল কোথায়? তা ছাড়া, ধরা যাক সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। মা যে একভাগ পাবে, তার কোনও উদাহরণ আমি দেখি নি।

দেবোত্তম - আরও একটা কথা। পিতামাতা থাকাকালীন পুত্রকন্যারা সম্পত্তি ভাগ করতে পারবেন না বলা হল, এটা কি দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা দুটো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল?

নন্দিনী - না। মা হবে গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী। আর কিছু নয়।

দেবোত্তম - আরেকটা বিষয় হল স্ত্রীধন। 'শালীনতা' ও 'সতীত্ব' রক্ষা আর বিধবার [শ্বশুরবাড়ির প্রতি]বিশ্বস্ত থাকা। অর্থাৎ স্ত্রীধন ততক্ষণই মহিলার অধিকারে থাকবে যতক্ষণ তিনি স্বামীর পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছেন।

নন্দিনী - এটা কিন্তু আগে ছিল না। স্ত্রীধনে কোনও শর্ত যুক্ত ছিল না। স্ত্রীধনের ১১টা শ্রেণী ছিল। জিমূতবাহন কমিয়ে বোধহয় ৮টা বা ৯টা করলেন । কিন্তু শুধুই মহিলারই নিজস্ব অধিকার। ইম্মুভেবল প্রপার্টি হলে সম্পূর্ণ মেয়েদের। রঘুনন্দন বললেন, স্ত্রী যদি শ্বশুরবাড়িতে থাকে তাহলেই সে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার পাবে না কিন্তু স্ত্রীধন নিয়ে কোনও বিধান দিলেন না।

দেবোত্তম - মনু বলছেন স্বামী যদি স্ত্রীধনের ভাগ নেন, তাহলে পরের মাসে তাঁকে সেটা ফেরত দিতে হবে। নাহলে তিনি পতিত হবেন।

নন্দিনী - পতিত হবেন কী, জিমূতবাহনে স্পষ্ট লেখা আছে যদি স্বামী, স্ত্রীর থেকে নেওয়া সম্পত্তি ফেরত না দেন, তাহলে স্ত্রী স্থানীয় অথরিটির কাছে যাবেন এবং যদি প্রমাণ হয় স্ত্রী সেই সম্পদ ফেরত পাননি, তাহলে স্বামীর জেল জরিমানা হবে।

দেবোত্তম - সতীত্বের যে অছিলা জুড়ে স্ত্রীধন কাড়ছে কোম্পানি সরকার?

নন্দিনী - না স্ত্রীধন কাড়ছে না, কাড়ছে প্রপার্টি অধিকার। প্রপার্টিই যদি তোমার না থাকে, তাহলে স্ত্রীধন কী তুমি সামলাতে পারবে? মহিলাদের অবস্থা কোম্পানি

আমলে দুর্বল হল।

দেবোত্তম - সম্পত্তির অধিকারই যদি না থাকে তাহলে আমার গয়না কেড়ে নিলে আমার কিছুই করার থাকে না।

নন্দিনী - না। সম্পত্তি নিয়ে অনেক মামলায় ডাইসি সমস্যা দেখেছি হাইড পেপারে। মেয়ে যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে থাকে না, তাই সে সম্পত্তির অধিকার পাবে না। কিন্তু এই রায়ের কোনও সূত্র দেওয়া হচ্ছে না। হয়ত অনেক মাইনর স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে। দেশে তো ১৮/১৯টা স্মৃতি সংহিতা আছে। হয়তো কাত্যায়ন— না কাত্যায়ন অতটা খারাপ লোক ছিল না— বৃহস্পতি থেকে কোনও একটা বিধান তুলে নিয়ে মামলায় রায় দেওয়া হতেই পারে। আমি বৃহস্পতিকে জুড়ে অনেক রায় দেখেছি- বলা হচ্ছে বৃহস্পতি বলেছেন সম্পত্তির রায় মহিলারা পাবেন না। এটা কিন্তু জিমূতবাহনও হল না বা মনুও হল না।

দেবোত্তম - বিধবাবিবাহ আইনে পঞ্চম ধারায় স্ত্রীধন বলা নেই ঠিকই, কিন্তু বলা আছে আগের বিবাহের ক্ষেত্রে যে স্ত্রীধন সম্পত্তি হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল, সে সব রাখতে পারবে— কিন্তু সম্পত্তি পাবে না। এটা কি আইনি অধিকার ছিল, না কি কাগজে-কলমে রাখতে হয় তাই রাখা?

নন্দিনী - তোমরা বলো, বিধবাবিবাহ কি আজও আমরা মেনে নিয়েছি? আমাদের দেশে বৈধব্যকে রোমান্টিসাইজ করা হচ্ছে। টিভি সিরিয়ালে দেখ। সব নায়িকাকে একবার করে বিধবা হলেই সাদা শাড়ি পরানো হয়। এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত।

দেবোত্তম - আইনে যে ধারাটাকে রাখা হল, সেটা কি আইনের জন্যে আইন?

নন্দিনী - কোন আইনের আর বাস্তবে প্রতিফলন হয়? খুন করলে ফাঁসি হবে মোটামুটি সকলে জানে, তা সত্ত্বেও খুন কি আর হয় না? মহিলাদের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক কোনও আইনের কোনও ভ্যালু নেই। আইন মেয়েদের জন্যে নয়।

দেবোত্তম - এই প্রসঙ্গেই বলি, অসমের শিবসাগর অঞ্চলের কেরি কলিতানি একটা কেস করলেন। তার নামে অসতীত্বের বদনাম দেওয়া হয়েছিল। ভ্রষ্টাচারের অভিযোগে তাঁর দেওর তাঁর সম্পত্তি দখল করে নেয়। কলকাতাতে সেই কেস আসে, কলকাতাতে সুপ্রিম কোর্ট ছিল। সেই রায় কিন্তু কেরির পক্ষে যায়। যদিও নিম্ন আদালতে তাঁর সম্পত্তির অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমার প্রশ্ন হল, বিধবাবিবাহ আইনের পরে আর কটা কেরি কলিতানির মতো কেস পেয়েছেন? অর্থাৎ কোনও মহিলা আইনের আশ্রয় নিয়ে মামলা করে তাঁর হক ছিনিয়ে নিয়েছেন। [এই সাক্ষাৎকারের বহু পরে নন্দিতাদি বিশ্বেন্দুকে বলেছেন মাথায় রাখবে কেরি কলিতানির কেসটা বাংলার নয়, আসামের।

আসামের বলেই সে মামলা জিততে পারল]

নন্দিনী - নাহ, সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাওয়ার উদাহরণ তো পাচ্ছিই না, যা পাচ্ছি বড়জোর গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকার। এইটুকু। বিধবাকে একটা বাড়ি হয়তো দেওয়া হয়েছে, কিছু অন্য সম্পত্তি পেয়েছেন। আমাদের সংবিধানে আছে, বিধবা তার সম্পত্তি যাবজ্জীবন ভোগ করবে। মরে গেলে কিন্তু সে কাউকে দিয়ে যেতে পারবে না। বিধবার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার নেই। মারা যাবার পর সেটা তার পরের পুরুষ উত্তরাধিকারীর কাছে চলে যায়। আপনি সম্পত্তি ভোগ বা এনজয় করতে পারবেন, তার বেশি কিছু নয়। এনজয় মানে ধর্মকর্ম, আর কিছুই করতে পারবে না। এই ধর্মকর্মের মধ্যে আমি একটা ফাঁক দেখেছি। ঐ যে গুরুধরা ব্যাপারটা ছিল না! সেই ফাটলটাকে মহিলারা কী যে দক্ষভাবে ব্যবহার করতেন! গুরু নির্ভরতার বিষয়টাকে নিয়ে আমি পরবর্তীকালে অনেক ভেবেছি। অল্পবয়সী বিধবা, হাতে অনেকটাই কাঁচা টাকা, সম্পত্তি— গুরু ধরে জীবনটাকে এনজয় করে নাও। এটা কিন্তু প্রচুর হয়েছে— এটা বলতে পারি। এটা নিয়ে হয়ত কেউ ভাবেননি।

দেবোত্তম - এই যে ব্রিটিশ কোর্টের জমানা শুরু হল, তার আগে বিধবাদের যেসব সম্পত্তি ছিল, সেগুলি কি তাঁরা বিক্রি করতে পারতেন? বা ট্রান্সফার করতে পারতেন?

নন্দিনী - হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্পূর্ণ দিয়ে দিতে পারতেন।

বিশ্বেন্দু - বাংলাতেই এই অধিকারটা মেয়েরা পেল কেন? [নন্দিনী - আমিও ভেবেছি] এটা কি এরকম যে আমরা ওয়ার্ল্ড ট্রেডের বড় অংশ ছিলাম, [নন্দিনী - একদম, আমি এটাই বলতে চাইছিলাম] পূর্বের ভিয়েতনাম থেকে পশ্চিমের ইস্তাম্বুল পর্যন্ত বাণিজ্য মহাসড়ক, বাংলা থেকে তিব্বত হয়ে মধ্য এশিয়া থেকে রুশ— তার মাঝে যেহেতু বাংলার অবস্থান, তাই বাংলাকে বিপুল ব্যবসা করতে হচ্ছে, এবং এই ব্যবসায় মেয়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনি কী মনে করেন নন্দিনীদি? মেয়েদের যদি [ব্যবসাজাত] সম্পদই না থাকত, তাহলে বাংলার মেয়েদের এই অধিকার দেওয়া হত না।

নন্দিনী - আমি তো উত্তর-পূর্বে নিয়মিত যাচ্ছি। হাট চালাচ্ছে মেয়েরা। ব্রিটিশরা আসার পরে সে সব হাতের কাজ উঠে গেল। মার্কেটও চলে গেল।

দেবোত্তম - বিশ্বেন্দুদাকে প্রশ্ন। আপনার অভিজ্ঞতায় কোন সময় থেকে আপনি বাংলায় মেয়েদের ব্যবসায় এনগেজমেন্টের বিষয়টা দেখছেন?

বিশ্বেন্দু - এখনও মহিলারা উৎপাদন ব্যবস্থায় আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রভাবে যে ব্যবসা আলোচনা হয়েছে, তার ফলে আমরা ধরেই নিচ্ছি

বাংলাজাত মূল ব্যবসা হল বিশ্ববাণিজ্য। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, আমার মূল ইকনমি কিন্তু স্থানীয়— স্থানীয় বাজারের জন্যে উৎপাদন করত। দিদি যেমন বলছেন, কোর্টটা ছিল স্থানীয়, সবাই সবাইকে চিনত। কলকাতার কোনও কোর্টে বা সদরের কোর্টে কেউ কাউকে চেনে না। উকিল মক্কেলকে চেনে না, বাদী বিবাদী বিচারককে চেনে না। কিন্তু জমিদারি অঞ্চলে মোটামুটি সকলেই সকলকে চেনেন, না হলে চিনে নেওয়া যায়, খুব কঠিন নয়। আওতার মধ্যে। আমার অর্থনীতিটা ছিল স্থানীয়। বাংলার সাহিত্যিকদের বিপুল অংশ মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছে— সাহিত্যিক কেন সাধারণ মানুষও। আমিই মামার বাড়িতে মানুষ। বাংলা থেকে পূর্ব দিকে যত যাবে ছেলেরা তত মেয়েদের কাছে ভেড়া হবে। নাথেদের গপ্পে আছে শিষ্য, ভেড়া হওয়া গুরুকে মেয়েদের কবল থেকে উদ্ধার করছে। এই যে স্থানীয় অর্থনীতিতে— যেমন হাট বাজার— মেয়েরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন, এখন সেটা মেছুনিতে এসে ঠেকেছে। তবে মেয়েরা চাষ না করলে চাষ বন্ধ হয়ে যায়। সুলতানি আমলে চিনা দূত গৌড়ে আসতে গিয়ে তাই বুঝেছেন। এক সময় হকার ইউনিয়ন করেছি, এখন কারিগর ইউনিয়ন করি। আমি উৎপাদন ব্যবস্থায় দৃশ্য অদৃশ্য মেয়েদের উপস্থিতি প্রতিনিয়ত অনুভব করি।

দেবোত্তম - আপনাকে এই প্রশ্নটা করছি কেননা সারা ভারতে কেন এই অধিকার থাকল না, অথচ বাংলায় থাকল কেন, এই ধাঁধাটার সমাধান করা দরকার। জিমূতবাহন একাদশ দ্বাদশ শতে স্মৃতির পাঁতি দিচ্ছেন। তাহলে কি আমরা ধরে নেব, তিনি মহিলাদের কাজ করতে দেখেছিলেন বলেই এই বিষয়টা রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন?

বিশ্বেন্দু - বৌদ্ধধর্মকে ডিকনস্ট্রাক্ট করুন। বুদ্ধ রাজার সন্তান। তাঁর বন্ধুরা বিশাল বিশাল শ্রেষ্ঠী। তানসেন সেন বলছেন শ্রেষ্ঠীরা তাদের ব্যবসা বিশ্বজুড়ে বাড়াতে চাইছেন। কিন্তু কাঠামো তৈরি নেই। গৌতম তো তার সময়ের শেষতম বুদ্ধ, ২৪তম বুদ্ধ। তিনি কাঠামো তৈরি করলেন, যে কাঠামো নির্ভর করে ব্যবসাটা এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে গেল। গোবির হৃদিঅক্ষে এশিয় রাজসড়কে একটা মঠ হল যার কয়েকশ কিমির মধ্যে মানুষ বাস করে না। সেই মঠ চালালেন শিক্ষিত বৌদ্ধ। ব্যবসা করতে যাওয়া মানুষদের শেল্টার দিলেন। আমরা এই বড় ট্রেড নিয়ে কথা বলি, রোমান্টিসাইজ করি। স্থানীয় ট্রেডের কথা বলি না— কারণ এখানে ছোটলোকেদের, অভদ্রবিত্তের নিয়ন্ত্রণ বেশি। মাথায় রাখা দরকার আজকে যাদের ছোটলোক বলি, সেদিন তারা ছোটলোক ছিল কি না সন্দেহ। লোকেশ্বর বসু আমাদের পদবির ইতিহাসে বলছেন, পুথি লেখক আর লেখানো মানুষের রোল রিভার্সাল হল পলাশীর পর। তো স্থানীয় ব্যবসা মেয়েদের হাতে। কেননা মেয়েরা তো ছেলেদের

ভেড়া করে রাখত। মেয়ে/ছেলে কারিগরেরা বিনয়ী হবে কেন? সে ৮০ ফুটের লোহার বিম তৈরি করে কোণার্কে, বিশাল বিশাল মন্দির তৈরি হচ্ছে, দক্ষিণের বিশাল বিশাল মন্দির মসজিদ, শহরের নানান কাঠামো তৈরি হচ্ছে। এই কারিগরেরা পলাশীর পরে কোথায়? একই ঘটনা মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঘটছে। আমরা পলাশীর পরের সময়ের মেয়েদের অবস্থা দেখে সেই বাস্তবতাটাকে ঠেলে দিলাম পলাশীর আগের সময়ে। ঔপনিবেশিক উপন্যাসে কারিগরদের বিনয়ী দেখায়। সে বিনয়ী হবে কেন? মেয়েরা হাটে যাচ্ছেন, তার প্রচুর বর্ণনা নেই? দিদির কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে, মেয়েদের হাতে ক্ষমতা যতদিন ছিল, আমরা অর্থনীতিতে ১ নম্বর বা ২ নং ছিলাম। যেমন হাড়ি ঝি! কী দুর্দান্ত ক্যারেক্টর! পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মেয়েরা ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করছে। লহনা খুল্লনা তার স্বামীর হাতের লেখা চিনতে পারছে! আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

নন্দিনী - আমি এ বিষয়ে ভীষণ একা। আমি উইমেন্স স্টাডিজে ১০ বছর চাকরি করেছি। ওরা পশ্চিমি ভাবনার বাইরে বেরোতে পারে না। অমিয়দা আমায় খুবই স্নেহ করতেন। হ্যালহেড কোডের কথা উনিই পয়েন্ট আউট করেছিলেন। উনি আমার থিসিসটা পুরো পড়েছিলেন।

বিশ্বেন্দু - অমিয়বাবু প্রথম মানুষ, যিনি বলেছিলেন ব্রিটিশ আমলে বিশ্বের প্রথম স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি প্রযুক্ত হয়। আমরা একটা ওয়েব আলোচনায় তাঁকে এনেছিলাম, সেখানে আমাদের যে বন্ধু আলোচনাটা কন্ডাক্ট করেছিলেন এবং অমিয়বাবুকে রাজি করিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, খুব কষ্ট হয়েছে অমিয়বাবুকে ওয়েব আলোচনার জন্যে রাজি করাতে।

নন্দিনী - আমায় একজনই বিখ্যাত মহিলা ভালোবাসতেন, তাঁর নাম মালিনী ভট্টাচার্য। যাই হোক, এই কাজগুলো আমার মাথায় আছে। আপনি যতটা বলছেন, ততটা হয়তো নেই, কিন্তু বোধটা ছিল, এতটা আর্টিকুলেট ছিল না। আপনি আরও বেশি কাজ করেছেন। এইটিন্থ সেঞ্চুরি নিয়ে কাজ করতে গেলাম, ভারতচন্দ্র ভালো করে পড়েছি। এই কাজগুলো করব কী করে? আমি যখনই বলব, ইওরোপিয় সময়ের আগে বাংলার মেয়েরা তুলনামূলক ভালো ছিল, তখনই ওরা আমায় গালি দেবে।

দেবোত্তম - আমার শেষ প্রশ্ন। আমরা রাণী রাসমণির উদাহরণ পাচ্ছি। তার আগের সময়ে বর্ধমানের রাণীর নাম পাচ্ছি, নাটোরের রাণীর নাম, দিনাজপুরের রাণীর নাম পেয়েছি, মহিষাদলের রাণীর নাম পেয়েছি। তারপর সব ফাঁকা। আবার ১৮৬১-তে রাণী রাসমণির নাম পাচ্ছি। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, মহিলারা যে ব্রিটিশ আমলে জমিদার হতে পারছেন, তার একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ রাণী রাসমণি?

নন্দিনী - না, রাণী রাসমণীর সামনে অনেক সমস্যা ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের ছিলেন না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে রক্ষণশীলতা ব্যাপক ছিল। তাদের, ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের মত ব্রাহ্মণ্য কাঠামো ছিল না। রাসমণি কৈবর্তদের, ছোটলোকেদের জমিদার ছিলেন। [বিশ্বেন্দু - সেখানেই শেষ] হ্যাঁ, সেখানেই শেষ।

দেবোত্তম - এছাড়া আর কোনও মহিলা জমিদারের নাম পাচ্ছি কি?

বিশ্বেন্দু - মুর্শিদকুলি ছোট জমিদারিগুলি বড় জমিদারিতে রূপান্তরিত করলেন। ছোটলোকেদের জমিদারিগুলো ক্রমশ বিলয় হয়ে যাবে।

দেবোত্তম - তার মানে কি ছোটলোকেদের জমিদারি আর থাকবে না এরকম একটা পরিবেশ তৈরি করা হল?

নন্দিনী - ছিরুপালের কথা ভাবুন। তারা সংস্কৃটাইজইড হয়ে গেল। এরা ব্রাহ্মণ্যবাদী নৈতিকতাগুলো নিজেদের ক্ষেত্রে রূপায়িত করল, আর সামাজিকভাবে করল- যেমন পালা পার্বণ আয়োজন করা, দুর্গাপুজো করা— এ সবই ব্রাহ্মণ্যবাদের রমরমা তৈরি করল। এটা করার সময় মেয়েদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। রাসমণি ছিলেন একা, একা লড়েছেন।

বিশ্বেন্দু - ব্রিটিশদের সাহায্যও যেমন করেছেন, তাদের বিরোধিতাও করেছেন।

নন্দিনী - সি ইজ নট আ প্যাটার্ন, সি ইজ এক্সসেপশান।

দেবোত্তম - দায়ভাগটা এখানে কী হল?

নন্দিনী - দায়ভাগটা এখানে ঘেঁটে গেল।

দেবোত্তম - দায়ভাগটা যদি ঘেঁটে যায়, তাহলে রাণী রাসমণি জমিদার হলেন কী করে?

নন্দিনী - জমিদার তো উনি হয়েছেন। ওকে কিন্তু ইংরেজরা খুব কিছু করতে পারে নি। রাণী রাসমণির মত আরও একটা লোককে তুমি দেখাও। [বিশ্বেন্দু - তাঁর পরিবারের তো আর কেউ ছিল না। তিনি বিধবা] হ্যাঁ, দেয়ার ইজ নো সেকেন্ড ইন্সট্যান্স। উনি স্রেফ ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম নিয়মকে প্রমাণ করে।

বিশ্বেন্দু - মীর মোশাররফ হোসেনের বইতে প্যারিসুন্দরীর উল্লেখ আছে। কিন্তু এগুলো ব্যতিক্রম।

দেবোত্তম - হ্যালহেড অনেকটাই বদল করেছেন।

নন্দিনী - হ্যালহেড বদল করেছেন, কিন্তু তার থেকে বেশি বদল করেছে কোলব্রুক ডাইজেস্ট। হ্যালহেড হল ৩৭৩ পাতা আর কোলব্রুকের ডাইজেস্ট হল তিনটে বড় বড় খণ্ড। উইলিয়াম জোনসকে লোকে পুজো করে। উনি কিন্তু

বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। উইলিয়াম জোনসের যে সব বাণী আছে না! তিনি বলছেন বেঙ্গলে মনুস্মৃতি বা শাস্ত্রকে ল' হিসেবে রূপান্তর করতে হবে— কারণ হিন্দুরা শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা করে। তারা আমাদের কমার্শিয়াল প্রসপারিটি তৈরি করে দিচ্ছে। তাই তাদের শ্রদ্ধার জিনিসকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। তাদের তোমরা খুশি রাখ। না হলে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। এটা ইনস্টিটিউট অব হিন্দু ল'র ইন্ট্রোডাকশনে আছে।

দেবোত্তম - জোনসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন ত্রিবেণীর কিংবদন্তি সংস্কৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

নন্দিনী - জোনস ওঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিলেন, উনি খুব বেয়াড়া লোক ছিলেন। ভীষণ পয়সার লোভ ছিল। [মাসে ৩০০ টাকা করে সে যুগে পেয়েছেন] ১১৬ বছর বেঁচেছিলেন। জগন্নাথ ডেফিনিটলি একজন গ্রেট স্কলার। কিছু কিছু লোক আছে না, স্কলাশিপ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে থাকে, কাউকে তোয়াক্কা করে না। জগন্নাথ এই টাইপের একজন পড়ুয়া। অজস্র নাতিপুতি ছিল— কিন্তু তিনি নিজের মতো করে থাকতেন।

দেবোত্তম - জগন্নাথ কি বিবাদভঙ্গার্ণব-এর মূল কারিগর, না কি জোনসের ইনপুট ছিল?

নন্দিনী - ইনপুট তো ছিলই। গাড়ি করে ওঁর বাড়ি গিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিতেন।

দেবোত্তম - আপনিও জগন্নাথকে গ্রেট স্কলার বলছেন এবং সে যুগেও জোনসও বলছেন। জগন্নাথকে বেছে নেওয়ার কারণ কি সেই স্ক্রিপচারকে অথেন্টিক প্রমাণ করা?

নন্দিনী - কম্পাইলেশনের মানে তো তাই। আমি তো আমাদেরর আইন তোমাদের ওপরে চাপিয়ে দিচ্ছি না। তোমাদের আইন তোমরা তৈরি করছ। আমাদের এখানে লেনাদেনা নেই। [দে+বি - তোমাদের বেস্ট পণ্ডিতকে দিয়ে আইন করালাম।] এখানে আমার কোনও দায় নেই। তুমি আমায় কিচ্ছু বলতে পারবে না। আই এম অ্যাডমিনিস্টারিং ইয়োর ল, দ্য নেটিভ ল। আমি আমার ল তোমাদের ওপরে চাপিয়ে দিচ্ছি না। আমি তোমাদের কাস্টমকে অ্যাডমিনিস্টার করছি। ঠিক আছে, কাস্টমারি ল নামটা আমি দিলাম না [বিশ্বেন্দু - তোমাদের আইন ছিল না, আমি তোমাদের আইন দিলাম]।

দেবোত্তম - এবারে বলার কথা, জোনসের পরে আর [আইনের] পরিবর্তন হল না, তার পর থেকে সেটাই চলতে থাকল।

নন্দিনী - না না পরিবর্তন তো হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারটাতেই দেখো না, সব আইন অনুযায়ী হয়েছে? মহারাষ্ট্রে এক ধরণের

বিচার চলে, বাংলায় আরেক ধরনের। হিন্দু ল হল একটা সিম্বল, সিম্বলিক স্ট্রাকচার। উই আর অ্যাডমিনিস্টারিং ইওর ল। আমি অনেক কিছু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু করতে পারিনি। আমাদের দেশে ধর্মশাস্ত্রের ট্রাডিশনটা- সেটা কিন্তু একটা লাইভ ট্রাডিশন। বহু ব্রাঞ্চ ছিল, গুরু-শিষ্য পরম্পরা ছিল, মীমাংসা টীকা ছিল। সেখান থেকে নিবন্ধ। এরা এটাকে ট্রান্সলেশনে নিয়ে এসে এই লাইভ ব্যাপারটাকেই মেরে দিল। শুরু হয়েছে উইলিয়াম জোনসের আমল থেকে। প্রথম অনুবাদ হল মনুস্মৃতি। তারপরে যে কত মনুস্মৃতি অনুবাদ হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। যাজ্ঞবল্ক্যও হয়েছে, কোলব্রুক করেছেন, নেইলসন করেছেন, এক একটা জায়গায় একই টেক্সট ভাষা পালটে অনুবাদ হয়েছে।

দেবোত্তম - এই প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা, জোনসের আগে মনুস্মৃতি আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ, এত সম্মানিত স্মৃতিগ্রন্থ ছিল?

নন্দিনী - মনুস্মৃতি ওয়াজ দ্য সাইট অভ দ্য ইভলিউশন অব ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ার্কি। এয়ার বা উত্তরাধিকারের টীকা- পুত্র না থাকলে পুত্রিকা উত্তরাধিকার হবে না। পুত্রের সব অধিকার থাকবে পুত্রিকার, এমনকি জ্যেষ্ঠতাও সে পাবে— বেঙ্গলে— ভুল বললাম, বেঙ্গল নয় সব জায়গায়। দুটো শ্লোক পরে বলা হল, পুত্রিকা অধিকার পাবে কিন্তু জ্যেষ্ঠতা পাবে না। তারপরে বলা হল, পুত্রিকা অধিকার পাবে, কিন্তু প্রপার্টি সামলাবে তার স্বামী। একটা অনুষ্ঠান ছিল, যার মাধ্যমে পুত্রিকাকে এই অধিকার অর্পণ করা হত। এই উদাহরণ শরৎচন্দ্রের কাশীনাথে দেখতে পাবে। কমলা ছিল এক পুত্রিকা। শেষে বলা হল, পুত্রিকার কাজ হবে শুধুই পুত্র উৎপাদন করা। তার কোনও সম্পত্তির অধিকার নেই, এটাই বিবাদভঙ্গার্ণবে রয়েছে। দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ক্যাটিগরি অব মেল এয়ার ইন বিবাদভঙ্গার্ণব। এখানে এটাই হল পুরুষদের সম্পত্তির অধিকারের ধারা। এই ধারাটাই তো মনুস্মৃতি [থেকে নেওয়া]। আর উদাহরণ দিচ্ছি না। মনু যে কী কন্ট্রাডিক্টারি।

এবার তোমার প্রশ্নে আসি। মনুস্মৃতি যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হবে তো তাহলে দায়ভাগ কেন থাকবে, তাহলে কেন মিতাক্ষরা চালু হল? মিতাক্ষরার এতগুলো ইন্টারপ্রিটেশন কেন হল? মিতাক্ষরার ইন্টারপ্রিটেশনের তো কোনও শেষ নেই। মনুস্মৃতিই যদি দেখবে, তাহলে লোকে কুল্লুকভট্টের টীকা নেবে কেন? দায়ভাগেরও কত ইন্টারপ্রিটেশন- শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, রঘুনন্দন, তার আগে গোবিন্দ রাজা। প্রশ্ন তাহলে কেন মনু এই গুরুত্ব পেল? এরা বুঝেছিল, মনু সাধারণের ইমাজিনেশনে ভগবান। মনুকে খুব সূক্ষ্মভাবে উপনিবেশের পক্ষ থেকে আমাদের ভেতরে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনুকে হাতিয়ার করে পিতৃতন্ত্রকে সমাজে প্রবেশ করানো হয়েছে।

দেবোত্তম - এই সূত্রেই বলতে চাইছি, যে দুজনকে মহিলাদের মেসিয়া বলা হচ্ছে— একজন রামমোহন, আরেকজন বিদ্যাসাগর— দুর্ভাগ্যবশত দুজনকে নিয়েই আমি কাজ করেছি। দুজনেই মনুকে অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

নন্দিনী - আমার প্রশ্ন হল, কেন কেন এঁরা মনুস্মৃতিকে এত গুরুত্ব দিলেন? তুমি [দেবোত্তম] তো এটা নিয়ে কাজ করেছ। বিধবার সতীদাহ বন্ধ করার বিধান দেওয়া হল। কিন্তু মনুতে যেভাবে স্ট্রিনজেন্ট, অস্টিয়ার উইডোহুডের কথা বলা হয়েছে, সেটা তো এই সময় থেকেই শুরু হল। হ্যালহেড বলেছে, তার আগে কি আমরা পাই মেয়েদের এত স্ট্রিনজেন্ট, অস্টিয়ার উইডোহুডের কথা? আমরা কি এটা পাই যে মেয়েদের মাথা ন্যাড়া করতে হবে? আমরা কি এটা পাই যে মেয়েরা নির্জলা একাদশী করবে? [দে+বি - বেনারসে পাঠিয়ে দিতে হবে?] ঠিক তাই। হ্যালহেড বলছেন, আমি তো দেখিনি। তাহলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, রামমোহন-বিদ্যাসাগর বাঙালি মেয়েদের যে ক্ষতি করেছেন, সেটা অন্য কেউ করেননি।

দেবোত্তম - জোনস মনুস্মৃতি অনুবাদ করে [সেই স্মৃতিশাস্ত্রকে ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চকদের কাছে] গুরুত্ব দেওয়ালেন। তার আগে যে মনু পণ্ডিতদের কাছে এত গুরুত্ব পেয়েছেন, সেটা দেখা যাচ্ছে না। আবার আমরা সমাজ সংস্কারক বা নারী উদ্ধারকর্তাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে না হলেও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে মনুকে ব্যবহার করা হল, এবং রামমোহন মনুর আশ্রয় নিলেন তো বটেই। এই যে দুই প্রবল ব্যক্তিত্ব মনুকে বিশাল গুরুত্ব দিলেন...

নন্দিনী - বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে [বিদ্যাসাগর] পরাশর ব্যবহার করছেন। বিদ্যাসাগর পরাশরের ওইটুকু নিদান লেখার পর তার পরের বিধানগুলো কেন দেখেননি, জানি না।

দেবোত্তম - ওটা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কলোনিয়াল প্রভুরা যে মনুকে এত গুরুত্ব দিলেন, এরা দুজন মনুকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে তাকে আমাদের সমাজে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুললেন না? অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রের নিগড় কি আরও বেশি চেপে বসল না?

নন্দিনী - যেন [অনুপস্থিত] জোনস এদের বলছেন, তোমরা মনুকে ভালোবাস তো তাহলে মনু ব্যবহার কর। মনু কিন্তু সতীদাহের কথা বলছেন না, তিনি স্ট্রিনজেন্ট, অস্টিয়ার্ড উইডোহুডের কথা বলছেন। আমি শিওর রামমোহন নিজে অস্টিয়ার উইডোহুডের কথা... আরে সতীদাহ তো [বাংলায়] ছিল না। আমি নিজে এটা ইন্ডিয়ান অফিস লাইব্রেরি, এখন ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে দেখেছি ১০০ বছরে ১১২৮টা সতীদাহ হয়েছিল।

দেবোত্তম - ব্রিটিশরা যে রেকর্ড রেখেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে টোটাল যে হিন্দু বিধবা তার ০.২% সতী হচ্ছেন। [নন্দিনী - অনেকে নিজেরাই সতী হয়েছে] হ্যাঁ সে তো আছেই। রেকর্ডে এটাও দেখা গেছে, স্বামী মারা যাওয়ার ৪০ বছর পরেও সতী হচ্ছেন। সেটা এক ধরণের আত্মহত্যাও বলা যায়। কিন্তু সেটা সতী বলে রেকর্ডেড হয়েছে। কিন্তু প্রাক-পলাশী বাংলায় ১৭৫৭ পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে— পর্যটকদের বিবরণ হতে পারে, মঙ্গলকাব্য হতে পারে, চৈতন্য সাহিত্য হতে পারে, কোথাও কোনও সতীর উল্লেখ পাই না [নন্দিনী - না, কোথাও কোনও সতী নেই]। তাই আপনার কাছে প্রশ্ন, তারা [ব্রিটিশরা] কেন মনুকে এত গুরুত্ব দিল?

নন্দিনী - আমিও আমার সেজ-এর প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছি, মনুকে এত গুরুত্ব কেন দিল। এরা যেভাবে সমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, সেই ডিজাইনটা তাহলে কি তারা মনুর মধ্যে পেয়েছে? তারা কি মেয়েদেরকে একটা নিগড়ের মধ্যে রাখতে চেয়েছিল? মনুতে বলা হয়েছে মেয়েরা ভীষণ খারাপ। মেয়েরা পুরুষ দেখলেও আকৃষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে নানান খারাপ কাজ করবে। অথচ আমাদের দেশে কামসূত্র আছে। ভারতচন্দ্র অভিসারিকা নারীর কথা বলছেন [বিশ্বেন্দু - স্বৈরিণীর কথাও বলছেন]। আমাদের দেশে বারবণিতা ছিল। কালিদাসে তো ছিলই, তারা শিষ্টাচারের সঙ্গে ৬৪ কলা শেখাত, পড়াশোনাও শেখাত। তো এই দেশে কী করে এই ধরণের আইন হয়?

অত্রি - ইউসিসির কথা এর আগে উঠেছে। আমরা মুক্ত মহিলাদের বিষয়ে বা প্যাট্রিয়ার্কির মধ্যে থেকেও মেয়েদের অন্য ধরনের জীবনযাপন করার যুগের কথা বলছিলাম, বিচার দেওয়াটা অঞ্চলে অঞ্চলে আলাদা ছিল, মুঘল আমলে তো ইউসিসির ধারণাটাই ছিল না; কিন্তু আজকে যখন ইউসিসি প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়, তাকে কি আমরা উপনিবেশের প্রথম দিককার সময়ের কাজকর্মের এক্সটেনশন হিসেবে দেখতে পারি?

নন্দিনী - ব্রিটিশ অভিন্ন দেওয়ানির কথা বলেনি। ওরা কম্পার্টমেন্টালাইজ করেছিল। এটার মধ্যে একটা হস্টিলিটি ইনফিউজ করার চেষ্টা ছিল। ওদের বক্তব্য তিনটে ল ছিল— হিন্দু ল, মহামেডান ল আর ট্রাইবাল ল। ছাতার মাথা কেথাও কোনও ল ছিল না, ট্রাইবালদের কাস্টমস ছিল, মুসলমানদের শরিয়া ছিল, হিন্দুদের শাস্ত্র আর কাস্টমস ছিল। [বিশ্বেন্দু - কাস্টমটাই মেন] হ্যাঁ তাই। [ব্রিটিশ পূর্ব সময়ে]এতগুলো ইন্টারপ্রিটেশন কেন? সমাজ যেমন বদলাচ্ছে, সেই অনুযায়ী প্রথাও বদলাচ্ছে। সেই সব বদল স্মৃতিকারেরা ইনকর্পোরেট করে নিচ্ছে। [বিশ্বেন্দু - ইসলামেও তাই হচ্ছে। শরিয়ার চারটে ইন্টারপ্রিটেশন]।[১২]

দেবোত্তম -অত্রি যেটা বলতে চাইছে, সারা ভারতবর্ষের জন্যে যে আইন প্রযোজ্য করার চেষ্টা হচ্ছে, এটার সঙ্গে ঔপনিবেশিক এই কাঠামোর যোগ আছে কি না।

নন্দিনী - না নেই। কোলব্রুক আর হ্যালহেডের এই ডাইজেস্ট, সেটা ভারত জুড়ে প্রযুক্ত হতে দেখিনি। আর স্থানীয়রা মানবেই না। ব্যবহারমাত্রিকার মত বহু স্মৃতিনিবন্ধ আছে, সে সব থেকে নিয়ে হিন্দু জুরিসপ্রুডেন্স তৈরি হয়েছে।

বিশ্বেন্দু - আইনের কাঠামো আর বিচারের কাঠামো তো প্যান ইন্ডিয়ান।

নন্দিনী - বিচারের কাঠামোতে কোন টেক্সট ব্যবহার করে কিসে সেই টেক্সট কাজে লাগাবে, সেটা তো অপশনাল ছিল। অপশনাল ছিল বলেই যদি আপনি কনস্টিটিউশন পড়েন, তাহলে দেখবেন সেই অপশনগুলো সেখানে জোড়া হয়েছে। মেয়েদের অধিকার নিয়ে এনসিয়েন্ট সেজরা যা বলছে, সেটাই রাখা হয়েছে। ব্রিটিশেরা হিন্দু ল তৈরি করেছে। তারা কোন জায়গায় কী টেক্সট ব্যবহার করবে, তার কোনও স্ট্রাকচার, ডায়রেকশন ছিল না, ওরাই তো তখন রাজা। কিন্তু সারা ভারতের অ্যাংলো হিন্দু জুরিসপ্রুডেনস নিয়ে কাজ হয়নি।

বিশ্বেন্দু - ১৮৫৭-র পরে যখন রাণীর শাসন হল, যখন কোম্পানিই উঠে গেল, যখন সুপ্রিম কোর্টের অধীনে সব কটা আদালত চলে এল, যখন কেস ল ধরে ধরে বিচার হচ্ছে, এই সময়টা [যখন মেকলের আইন প্রযুক্ত হল] তো সারা ভারতেই সমান আইন প্রযুক্ত হচ্ছে। আপনি কী মনে করেন?

নন্দিনী - না। অপশন অনুযায়ী। এটায় ডিস্ক্রিশনের ব্যাপার ছিল। তবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই যে হাইড পেপার্স, মোটামোটা ৪৪টা খণ্ড, একে ব্রিটিশরা প্রিসিডেন্স ল বলেছিল, ওরা তখন আর টেক্সট মানত না।

বিশ্বেন্দু - আমার মনে হয় কেস ল আর প্রিসিডেন্স ল— দুটোই এক।

নন্দিনী - ইউনিফর্ম সিভিল ল, এখন যেটা করার চেষ্টা করছে, সেটায় সমস্যা হবে।

অত্রি - এটায় কি কলোনিয়াল আইনের পরম্পরা পাচ্ছেন?

নন্দিনী - না, একেবারেই না। ইওরোপে এটা হয়েছিল, জার্মানিতে, ব্রিটেনে— যখন নেশন স্টেট তৈরি হচ্ছে, সে সময় একটা কমন ল তৈরি করার চেষ্টা করেছে। এটা নেশন স্টেটের একটা ডিভাইস।

বিশ্বেন্দু - এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক কৃষ্টি। ফলে এক আইনও।

নন্দিনী - ইউনিফর্ম সিভিল কোড কীভাবে সারা ভারতে প্রয়োগ করবে? দক্ষিণ ভারতে কী করবে? ব্রিটিশ আমল থেকে খাসিয়াদের মেট্রিলিনিয়াল সামাজিক কাঠামো ভাঙার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু খুব সহজ কাজ হচ্ছে না। আসল উদ্দেশ্য

হল মুসলমানেদের ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া। সেটা তারা পারবে বলে মনে হয় না।

বিশ্বেন্দু - শঙ্করাচার্য বড় মাপের চিন্তক এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে কাঠামো তৈরি করার যুগপুরুষও। তিনিও চারদিকে চারটে মঠ তৈরি করে চার প্রান্তের মানুষকে নিজের অনুগামী করতে পারেন নি— মাথায় রাখবেন সে মঠ দেড় হাজার বছর পরেও প্রায় সমানতালে আজও সক্রিয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে, জৈনদের সঙ্গে লড়াই করা তাঁর মত যুগন্ধর মানুষও বিপুল অবৌদ্ধ, অজৈনদের অনুগামী হিসেবে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন।

নন্দিনী - ইউসিসি বিজেপির ইউটোপিয়া। এ বিষয়ে আর কীইবা বলব। বিশ্বেন্দু তো যা বলার বলে দিলেন।

দেবোত্তম - বিশ্বেন্দুদা তো নিজের অবস্থান বলেছেন, আপনি এ বিষয়ে অথরিটি। আপনি কেন এটাকে উদ্ভট জিনিস বলে মনে করছেন, সেটা যদি বলেন।

নন্দিনী - বেঙ্গলের এক রকম সিস্টেম, উত্তরে আরেক রকম কাস্ট সিস্টেম, দক্ষিণে আরেক রকম, উত্তর-পূর্বে আরেক রকম, ছোটনাগপুর ট্রাইবাল অঞ্চলে আরেক রকম।

দেবোত্তম - এটার কারণ কি ইসলামোফোবিয়া? মুসলমান সমাজে যেহেতু একটা পার্সোনাল ল আছে, তাকে খণ্ডিত বা বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি? শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছিলেন, দেশে একটাই বিধান হোক— দুটো বিধান থাকবে কেন?

নন্দিনী - সেটা তো বটেই। কিন্তু সেটাকে কি পারবে? ভোটে প্রভাব পড়বে কিছুটা। বম্বের এক মহিলা এটা নিয়ে বহুকাল ধরে লিখছেন। বা ধর, কাস্টমারি ল কে ডকুমেন্ট করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু কাস্টমকে কী ডকুমেন্ট করা চলে? এই সব ভুলভাল কাজ কিছুকাল চলবে। আদতে ইউনিফর্ম সিভিল কোড করতে গেলে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ করতে হবে- সেটা করুক তারা। কত পণ্ডিত লাগবে...

অত্রি - নেশন স্টেটের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে, সেখানে বৈচিত্র অনেক কম।

নন্দিনী - ফ্রান্স একটা কত বড় দেশ? এই সব ইওরোপীয় নেশন স্টেটে এইসব হয়েছে। নেপাল একটা ছোট্ট দেশ। আমি নেপালে কাজ করেছি, অনেক ট্রাইবাল কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করেছি। ওরা ওখানে ওয়ান রেলিজিয়ান, ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি করেছে। ওদের রেলিজিয়ান এক নয়। লোকে ছিটকে ছিটকে চলে যাচ্ছে। ওখানেও সহজ হচ্ছে না।

দেবোত্তম - বিভিন্ন রাজ্যে যত জনজাতির লোক রয়েছে, তাদের এত আলাদা আলাদা নিয়ম কানুন...

নন্দিনী - তাদের আনা সম্ভবই না।

অত্রি - এখানে হিন্দু-মুসলিম বাইনারি করছে। কিন্তু ট্রাইবাল অঞ্চলের মানুষ বলছে, তারা এই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও উৎসাহী না।

নন্দিনী - তাদের কীভাবে ইউনিফর্ম কোডে আনবে? তারা তো শেডিউলড ট্রাইব। কাস্টমের ওপরে তাদের এই স্ট্যাটাস নির্ভর করছে। তারা কি শেডিউলড ট্রাইব স্ট্যাটাস ছাড়বে, তারা যেখানে এত প্রিভিলেজ পাচ্ছে? আমি অসমে দেখেছি। নর্থ ইস্টে কত দিন ধরে কাজ করছি। ওরা নিজেদের কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র বজায় রাখবে-তাদের কাস্টম, লিগাল... কাস্টম তাদের আইডেন্টিটি। তারা সহজে ছেড়ে দেবে?

দেবোত্তম - এখন ভারতের কোনও প্রান্তে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আছে? বিশেষ করে উত্তর-পূর্বে?

নন্দিনী - খাসিদের মধ্যে... সেটা নিয়ে বিশাল চর্চা চলছে। ব্রিটিশরা সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এটা ম্যাট্রিলিনিয়াল ব্যবস্থা ছিল। ছোট মেয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। সেটার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আমলারা লিখছেন। এদের দাবি মেয়েদের ভূমিকা খর্ব কর, উত্তরাধিকারী হোক পুরুষ ইত্যাদি। যে খ্রিশ্চানিটি উত্তর-পূর্বে গেল সেটা কঠোরভাবে পিতৃতান্ত্রিক। আরেকটা সমস্যা হল, এই সময়ে বহু মাইগ্রেটেড বাংলাদেশির সঙ্গে বিয়ে-থা হচ্ছে। সেটা আরেকটা সমস্যা তৈরি করছে। খাসি সমাজ নিয়ে বিপুল ঝামেলা চলছে— বলা হচ্ছে যারা বাংলাদেশিদের বিয়ে করছে, তাদের সম্পত্তির যতটুকুও অধিকার আছে, দেওয়া হবে না। এটা নিয়ে একটা বিল পাস করার চেষ্টা... কিন্তু ঝামেলা কমেনি— এটাকে কন্টেস্ট করা হচ্ছে। খাসিরাই মেজর ম্যাট্রিলিনিয়াল স্ট্রাকচার। তারা ছাড়া অন্য কোনও সমাজ নেই।

দেবোত্তম - নন্দিনীদির বইটাকে আমার বিদ্যাসাগর বিষয়ক বইটার শিরদাঁড়া বলা চলে। গার্ল্যান্ড ক্যাননের বই থেকে জোনসের চিঠিপত্র পড়ে আমি বুঝতে পারি, তিনি প্রায় কিছুই সংস্কৃত জানতেন না। আমি এই প্রাইমারি দুই সোর্সকে ইন্টাররিলেট করে ব্যবহার করি। সে এক বছর সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক আর ল্যাটিনের মিল খুঁজে পাচ্ছে। এর পরেই সংস্কৃত ভাষা নিয়ে একটা উচ্চমন্যতা তৈরি হবে।

নন্দিনী - সংস্কৃত কেন্দ্রিকতা কলোনির দান। নিকোলাস ডির্ক্স বলছেন ব্রিটিশ আমলে

জাতিকঠোরতা অনেক বেশি পোক্ত হয়েছে।

বিশ্বেন্দু - বাংলার অবনমন ঘটেছে মেয়েদের ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্যে এবং এটা ঘটেছে কলোনিয়াল আমলের শুরুতে। এই কথাটা আপনি ইংরেজিতে সামাজিক ক্ষমতা যাওয়ার তরিকা বলেছেন, এর সঙ্গে জুড়তে হবে অর্থনৈতিক পতন এবং সব মিলিয়ে এই কথাটা বাংলায় বলতে হবে। মেয়েরা সে সময়ে জমিদার— সে তো সিইও। তার অঞ্চলের ম্যানেজার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে চালানোর দায় তাঁর কাঁধে [নন্দিনী- শরৎচন্দ্রের দত্তাতেই তো পাচ্ছি। তার কাছে একজনকে নরেনকে আসতে হল]। তাকে হঠিয়ে দিলেন আপনারা। একটা দুটো ব্যতিক্রম বাদে মহিলা জমিদার কই?

নন্দিনী - ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে যেতে হবে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যেতে হবে— সেখানে প্রচুর ডকুমেন্ট আছে। বিষ্ণুপুরের যোগেশচন্দ্র মিউজিয়ামে যেতে হবে। সারা পশ্চিমবঙ্গে এত লোকাল মিউজিয়াম আছে— যেমন জিয়াগঞ্জে— সেখানে যেতে হবে। পুরুলিয়ায় একটা লাইব্রেরি আছে— সেখানে কোর্ট কেস, গদ্য, পাঁজি ইত্যাদি আছে, সেখান থেকে তথ্য নিতে হবে। আরও অনেক জায়গা আছে, সে সব জায়গায় যেতে হবে।

তথ্যসূত্র/পাদটীকা

১. জেরেট অনূদিত 'আকবরনামা'য় বলা হয়ছে বাংলার মহিলারা দলবেঁধে রাজস্ব দিতে আসতেন:

His Majesty in his goodness has confirmed this custom. Their staple food is rice and fish; wheat, barley and the like not being esteemed wholesome. Men and women for the most part go naked wearing only a cloth about the loins. The chief public transactions' fall to the lot of the women. Their houses are mmade of bamboos, some of which are so constructed that the cost of a single one will be five thousand rupees or more and they last a long time. Travelling is by boat, especially in the rains, and they make them of different kinds for purposes of war, carriage or swift sailing. Fors siege they are so adapted that when run ashore, they overtop the fort and ইত্যাদি।

২. ...few Bengali women of respectability will consent to appear before strangers. The part of the house she inhabits is that farthest away from publicity, and is called emphatically the 'inner place'. Baijayanti Chatterjee-র প্রবন্ধ Transport, Mobility and Mobile Groups

in Bengal

৩. আনিসুজ্জামান, ফ্যাক্ট্রি করস্পন্ডেন্স অ্যান্ড আদার বেঙ্গলি ডকুমেন্টস :সাপ্লিমেন্টারি টু জে এফ ব্লুমহার্ড'স ক্যাটালগ অব দ্য বেঙ্গলি অ্যান্ড আসামিজ ম্যানুস্ক্রিপ্টস ইন দ্য লাইব্রেরি অব দ্য ইন্ডিয়া অফিস, ১৯২৪

৪. Since 1792 in consequence of the annually decreased demand for Dacca goods, a number of Manufacturers, from want of employment, have discontinued weaving cloth. Some of them have engaged in other occupations, and some are reduced to much a State of indigence as to render it unsafe to trust them with advance even were the demand for cloth to be increased. Under these circumstances I am of opinion, that cloths to an amount exceeding eighteen lacs of Sicca Rupees could not by any exertion, now be procured from the Dacca Aurangs in the course of one year, and that it would require at least three years of continued encouragement to restore to the Aurangs the ability of providing cloths which they possessed in 1792.

৫.

Years: 1786-87

Aurangs	Houses	Looms	Weavers	Houses	Looms	Weavers
Dacca	1560	2116	4039	1542(–18)	2041(–75)	3896(–143)
Titbadi	789	779	1624	608(–181)	741(–38)	1364(–260)
Dhamrai		1246	2783	492	503(–743)	906(–1877)
Chandpur	275	308	685	201(–74)	256(–52)	438(–247)
Narayanpur	1178	1178	3112	745(–433)	722(–456)	1964(–1148)
Sonargaon	1113	1190	2956	820(–293)	902(–288)	2047(–909)
Jangalbari	355	1136	1136	664(+309)	1213(+77)	1218(+82)
Srirampur	323	395	608	362(+39)	501(+106)	611(+3)
Total:	5443	8348	16943	5470	6879	12444
Change since				+27	–2469	–4499

৬. It was complained that weavers were forced — even imprisoned and beaten up — to accept advances. There were instances where the weavers in an aurang collectively refused to accept advances because the price offered was low or the condition of engagement detrimental to their interest." The form of agreement was amended," but usually the factory found the representations unacceptable and, when its assurances failed to soothe the aggrieved weavers, threatened to prosecute them for obstructing the work of the Company.™ When the threats were put into practice weavers or

their muhrirs were sentenced to imprisonment and their properties distrained by orders of the courts either for breach of peace or for impairing the work of the Company.

৭.

Year	Volume of export (in rupees)
1747	2850000
1787	5000000
1797	1401545
1807	861818
1810	556996
1813	338114

৮. টিপু ছিলেন ভিগোরাস পড়ুয়া। চামড়ায় বাঁধানো বই মেঝেতে, চামড়ার ব্যাগে ডাঁই দিয়ে পড়ে থাকত- যখন খুশি বই পড়তেন। ...library and depot of manuscripts, was a dark room, in the S.E. angle of the upper verandah of the interior quadrangle of the palace. Instead of being beautifully arranged, as in the Bodleian, the books were heaped together in hampers, covered with leather; to consult which, it was necessary to discharge the whole contents on the floor. Joshua Ehrlich, Plunder and Prestige: Tipu Sultan's Library and the Making of British India)

মেজর স্টুয়ার্টের করা টিপু সুলতানের বই-এর শ্রেণী বিভাগ:

Subject	Number of Books	Language(s)
Poetry	213	Persian, Arabic, Hindy, Dekhany
History	118	Persian, Arabic
Sufyism	115	Persian, Arabic
Jurisprudence	95	Arabic, Persian
Physic	62	Persian, Arabic
Philosophy	54	Arabic
Letters	53	Persian, Arabic
Theology	46	Persian, Arabic
Traditions	46	Arabic, Persian
Philology	45	Persian, Arabic
Korans	44	Arabic
Commentaries	41	Arabic, Persian
Prayers	35	Arabic, Persian
Lexicography	29	Persian, Arabic
Ethics	24	Persian, Arabic
Astronomy	20	Persian, Arabic
Arts and Sciences	19	Persian, Arabic
Fables	18	Persian
Arithmetic and Mathematics	7	Persian, Arabic
Prose Works	6	Hindy, Dekhany, Turkish

৯. কেস ল'র সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে Case law, also used interchangeably with common law, is a law that is based on precedents, that is the judicial decisions from previous cases, rather than law based on constitutions, statutes, or regulations. Case law uses the detailed facts of a legal case that have been resolved by courts or similar tribunals.

১০. যাঁরা আজ মহিলা বিল পেশ করা নিয়ে উদ্বেলিত, তাঁদের জন্যে বলা যাক, আশুতোষ-পুত্র শ্যামাপ্রসাদদের জনসঙ্ঘ চায়নি মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাক, যে অধিকার শ্যামাপ্রসাদদের বিদেশি পিতারা ১৯০ বছর আগে হ্যালহেডকে দিয়ে আইন করিয়ে কেড়ে নিয়ে সতী করার হুমকি নয়, বাস্তবে সতী করিয়েছিল, সে অধিকার তারা মেয়েদের ফেরত দিতে চায় নি। মণিকুন্তলা সেনের লেখা থেকে হিন্দু কোড বিলের বিপক্ষে শ্যামাপ্রসাদের দলবলের কার্যকলাপ:

"এরপরে একটা বড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে আমরা গোটা সমাজেরই এক নতুন চেহারার মুখোমুখি হলাম। হিন্দু কোড বিলের আগে 'রাও বিল' নামে একটা বিল পাশ হয়েছিল পার্লামেন্টে। নারীর অধিকারের ব্যাপারে সে বিল ছিল অসম্পূর্ণ। তাই পার্লামেন্টে নতুন করে এল হিন্দু কোড বিল। এই বিলের নিরিখে দেখার সুযোগ পেলাম নামি ও দামি লোকেরাও সমাজ চেতনায় কত সংকীর্ণমনা এবং কত রক্ষণশীল। এই বিলে মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, 'শিশুবিবাহ' ও 'বহুবিবাহ' বন্ধ করা হয়েছে, অসবর্ণ বিবাহকে হিন্দু বিবাহ-বিধিতে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং কতগুলো নির্দিষ্ট কারণ থাকলে মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারও স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া এই বিলে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অংশীদারত্বও স্বীকৃত। অর্থাৎ, নারী সমাজকে পরিপূর্ণ আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে এই আইনে। ... কিন্তু আগে কি জানতাম এই বিলের বিরোধিতা করতে নামবেন বড়ো বড়ো সব নামজাদা লোকেরা? স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী প্রমুখ অনেক রথী মহারথীরাই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। হিন্দু সমাজে গেল গেল রব উঠল। আমরাও নিশ্চেষ্ট ছিলাম না। কোনও ভালো আইনজ্ঞের সাহায্য ছাড়া বিলটায় কি আছে আর নেই তা বুঝতে পারা সহজ ছিলো না। মনুসংহিতায় কী আছে তাও একটু দেখে নেওয়া দরকার ছিল। আমরা প্রখ্যাত আইনজ্ঞ অতুল গুপ্ত মহাশয়ের কাছে গেলাম। তাঁর কাছ থেকেই আমরা সংগ্রহ করতে পারলাম আমাদের প্রচারের মালমশলা। নানা জায়গায় তাঁর বক্তৃতার জন্য আমরা মহিলা ও ভদ্রলোকদের নিয়ে ঘরোয়া সভারও আয়োজন করেছিলাম। ...আমরা সেই সময় প্রচারমূলক কর্মসূচীর সমাপ্তি উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটা জনসভা ডেকেছিলাম। প্রধান বক্তা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আর সভানেত্রী ছিলেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। মিটিংএর ঘন্টাখানেক আগে আমরা হলের দুয়ারে গিয়ে তাজ্জব। হল তখন পরিপূর্ণ। রাস্তা বা গেট দিয়ে প্রধান বক্তা বা সভানেত্রীকে নিয়ে আমরা ঢুকতেই পারছি না ভিড়ের ঠেলায়। ভাবলাম হয়তো আমাদের মিটিং শুনতেই এত লোকের আগমন। ...তাদের চেহারা আর হাবভাব দেখেও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। অতিকষ্টে ভেতরে ঢুকে দেখি মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ...অনুরূপা দেবীও উপস্থিত। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। কী করব এখন? শ্যামাপ্রসাদকে বললাম, এটা তো আমাদের ডাকা সভা, মিসেস নাইডু এসেছন বক্তৃতা করতে। উনি বললেন, 'বেশ তো করুন না মিটিং'। মিসেস নাইডুকে যেন

তিনি চেনেন না এমন ভাব দেখালেন। কোনও মতে মিসেস নাইডুকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিসেস নাইডুর কম্বুকণ্ঠ ডুবে গেল সভাস্থ লোকের হল্লায়। খানিকক্ষণ বলার বৃথা চেষ্টা করে তিনি বসে পড়লেন। এই মিটিং আমরা করতে পারব না বুঝে বিশেষ অতিথিদের নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ...

শ্যামাপ্রসাদের স্বরূপ আমরা দেখেছিলাম পূর্ব-বর্ণিত সভায়। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, গাড়ি গাড়ি মেয়ে আনা হয়েছিল পাথরেঘাটা থেকে এবং তাদের বলা হয়েছিল সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান করে দেবার আইন বন্ধ করার জন্য তোমাদের যেতে হবে। বেচারারা মুসলমান হবার ভয়ে এসে হল্লা করে গেল। দুটো করে টাকাও নাকি প্রত্যেকে পেয়েছিল।"

১১. দেউলিয়া রিচার্ড বিচারের আশ্চর্যজনক ঘটনা, জেমস হোলজম্যান-এর 'নবোবস ইন ইংল্যান্ড - আ স্টাডি অব দ্য রিটার্নড অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ১৭৬০-১৭৮৫' বই থেকে। তিনি বইতে আলোচনা করেছেন পলাশীর তিন বছর পর থেকে ২৫ বছর ধরে বাংলা এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সিতে কোম্পানির আমলা বা ফ্রি বিজনেসম্যান বা ইন্টারলোপারদের ইংল্যান্ডের কর্মকাণ্ড। এদের বিলেতে ব্যঙ্গ করে নবোব বলা হত। এদের একজন পলাশীর অন্যতম অনুঘটক রিচার্ড বিচার। রিচার্ড বিচারের জন্ম ১৭২১-এ। ১৭৪৩-এ বাংলায় পদার্পণ। ১৭৪৫-এ ফ্যাক্টর। ১৭৪৬-এ কাশিমবাজার কাউন্সিলের চতুর্থ সদস্য। ধাপে ধাপে উত্তরণ। পরে দ্বিতীয় সদস্য এবং জুনিয়র মার্চেন্ট। ১৭৫১-য় সিনিয়র মার্চেন্ট এবং গভর্নর কাউন্সিলের ১১তম সদস্য। ১৭৫৬-য় ঢাকা কুঠির প্রধান কুঠিয়াল, গভর্নর কাউন্সিলের চতুর্থ সদস্য। ১৭৫৬-র বিপ্লবের ধাক্কায় পলায়ন, ঢাকায় ফরাসি কুঠিতে আশ্রয়, আতিথ্য গ্রহণ। ১৭৫৭-য় বাংলায় লন্ডন থেকে আমদানি মালের গুদামের মালবাবু। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করায় তার লুঠের অংশ ২৭০০০ পাউন্ড। তিনিই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পলাশীর বিপ্লবের পর সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের উপযুক্ত উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করতে। ১৭৬১-তে অবসর। মনে হয় ১৭৬৭ পর্যন্ত ভারতে অনুপস্থিত থেকে আবার বেঙ্গল কাউন্সিলের পঞ্চম সদস্য হিসেবে কাজে যোগ দেন। কাউন্সিলের দ্বিতীয় এবং মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল অব রেভিনিউ-এর প্রধান হন ১৭৭০এ। মন্বন্তর বা গণহত্যা রোখায় শ্রম দেন। ১৭৭১-১৭৮১ পর্যন্ত আবার ভারতে অনুপস্থিত। ১৭৭৫ সালে সারের ট্যাড্রিজ, রুকসনেট জমিদার। নতুন প্রাসাদ। ১৭৭৩ থেকে লন্ডনে পোর্টম্যান স্কোয়ারে বাস। ১৭৭৫-১৭৮৩ পর্যন্ত কোম্পানির ডিরেক্টর। 'সোসাইটি ফর দ্য ডিসচার্জ অব রিলিফ অব পার্সনস ইম্প্রিজনড ফর স্মল ডেটস' নামে একটি সমিতির পরিচালক। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করে আর্থিক অব্যবস্থাপনায় বিশাল ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন। ঋণের অঙ্ক ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড। ঋণ থেকে উদ্ধারের আশায় আবার ভারতে চাকরি করতে আসার প্রস্তাব দিলেন কোম্পানি কর্তাদের। ১৭৮১-তে বাংলায় এলেন ঢাকার টাঁকশালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে বৃত হয়ে। ১৭৮২-র ১৭ নভেম্বর কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর প্রথমা স্ত্রী শার্লট গলিঘ্যাটি। তাঁদের কন্যা শার্লট ১৭৫৬-র গোলযোগের সময় ফলতায় মারা যান। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এন হ্যাসেলবির কন্যার নামও শার্লট, ১৭৬৭-তে জন্ম, বিবাহ করেন মেজর চার্লস ম্যারস্যাককে। এক পলাশী ঘটক নবোবের লন্ডনে ফিরে ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড ঋণে ডুবে যাওয়ার পর অবশ্য গন্তব্য হয় বাংলা। প্রবণতাটা লক্ষ্য করুন, ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড ধার মাথায় নিয়ে একজন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাক্তন ডিরেক্টর বাংলায় আসছেন তার পুরোনো চাকরিতে, ধনভাগ্য ফেরাতে!কখন? বাংলার প্রথম গণহত্যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দশ বছর পর, বাংলা বাঙালি

যখন রিক্ত শতচ্ছিন্ন। ধন্য বাংলা !লুঠ সময়ের মাত্র আড়াইশো বছর কেটেছে, কিন্তু বাংলা লুঠের ইতিহাস লেখা এখনও হয় নি। এ দায় আপনার আমার সক্কলের। আমরাই পারব।

১২. খ্রিষ্টিয় সন্ত সেবাস্টিও মনরিকের জাহাজডুবির পর সড়কপথে ইওরোপ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি দল নিয়ে ওডিসা থেকে বাংলার দিকে যাচ্ছিলেন। দলের এক মুসলমান সঙ্গী মেদিনীপুরের এক গ্রামে তিনটি ময়ুর মারে। সেটা নিয়ে খুবই বাওয়াল হয়। নারায়ণগড়ে শিকদারের (যিনি ধর্মে মুসলমান)দপ্তরে অভিযোগ করা হলে শিকদার অভিযুক্তকে বলেন, 'তুমি তো বাঙালি এবং মুসলমানও...? তুমি কী করে একটি হিন্দু জেলায় একটা জীবন্ত প্রাণী হত্যার সাহস করলে?' মনরিকে বিচারসভায় অভিযুক্তর পক্ষে কোরান উদ্ধৃত করে অনেক যুক্তি দিলেও শিকদার মনরিকেকে বললেন, 'আপনি যা বলেছেন সে সব ধর্মীয় সত্য, কিন্তু ৬৫ বছর আগে আকবর যখন বাংলা দখল করেন, তখন তিনি কথা দিয়েছিলেন, 'তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরীরা তাদের [বাঙালি]নিজেদের যাপন, প্রথা ইত্যাদির ওপর কোনও হস্তক্ষেপ করবেন না, তিনি (শিকদার)সেই নির্দেশ উলঙ্ঘন করতে পারেন না।' হাত কাটার বিধান থাকলেও তাকে চাবুক মেরে ছেড়ে দেওয়া হল।

একজন বাঙালি মুসলমানকে হিন্দুদের কোনও একটা স্পর্শকাতর বিষয় উল্লঙ্ঘনের জন্যে একজন মুসলমান বিচারক শাস্তি দিচ্ছেন, এটা আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল, সুলতানি, নবাবি আমল নিয়ে ইওরোপিয়দের বানানো, হিন্দুত্ববাদী প্রচার নিপাত যাক। সূত্র ঈটন, ইসলাম ইন বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার।

উপনিবেশিক আইন গ্রন্থের প্রতিস্থাপনায়

আদর্শ ভারতীয় নারী - হ্যালহেড, জোনস ও কোলব্রুক

নেপালচন্দ্র সূত্রধর স্মৃতি বক্তৃতা ।। জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ বিরোধী চর্চা/ কর্পোরেট বিরোধী চর্চা আয়োজিত চার পর্বের আলোচনার প্রথম পর্ব।। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' - ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া ।। ২-৪ মে ২০২৪, অনিতা ব্যানার্জী মেমোরিয়াল হল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।।

কারিগর শ্রেষ্ঠ, বঙ্গীয় পারম্পরিক কারু ও বস্ত্র শিল্পী সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছো কৃষ্টি কারিগর নেপালচন্দ্র সূত্রধর ২০২২এ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি শুধুই ছো মুখা কারিগর ছিলেন না, ছো কৃষ্টির জ্ঞানভাণ্ডার ছিলেন। নেপালচন্দ্র সূত্রধর বহুমুখী দক্ষতা প্রদর্শনে সারা বিশ্ব ঘুরেছেন। সেই অসামান্য নেপালচন্দ্র সূত্রধর স্মৃতিবক্তৃতা দিলেন গবেষক, অষ্টাদশ শতকের শেষ সময়কে নতুন করে চিনতে শেখানো নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডা। তিনি ধারণা পালটানো বই লিখেছেন, *এপ্রোপ্রিয়েশন এন্ড ইনভেনশন অব ট্রাডিশন*। নন্দিনী তাঁর বক্তৃতায় বললেন, হেস্টিংস, হ্যালহেডকে যে 'আইন' তৈরি করার বরাত দিলেন, বাংলা সংস্কৃত ফারসি না জানা হ্যালহেড যে বিবাদভঙ্গার্ণব বই পণ্ডিতদের দিয়ে তৈরি করালেন, সেই গোটা ব্যাপারটা ট্রাডিশন নয়, ইনভেনশন এবং এপ্রোপ্রিয়েশন কারন এর আগে এই ধরণের 'আইন' নামক একদেহী বই ছিল না, তৈরি করা হল। যে জন্যে একে দখলদারি বা এপ্রোপ্রিয়েশন বলছেন। আইনের নতুন বই তৈরি হল বলে একে ইনভেনশন বললেন। ঔপনিবেশিক লুঠেরা রাষ্ট্র তৈরি প্রক্রিয়ায়, উপনিবেশ তার সাম্রাজ্য চালানোর চাহিদায় যে সব স্মৃতি, বিধান, প্রথা আইনে ঠাঁই দেওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছে - সে মিতাক্ষরা থেকেই হোক, বা দায়ভাগ থেকেই হোক, বঙ্গ পণ্ডিতদের মাসে ১০০ টাকা মাইনেয় মাছিমারা কেরানীর মত কাজে লাগিয়ে সেই সব স্মৃতিবই থেকে ইচ্ছে মত নীতি সংকলন করে তাকে আইনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই আইন বলে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার কাড়া হল। জমিদারির অধিকার কাড়া হল। তারা যাতে এই অধিকার ছাড়তে বা বাধ্য হয়, সেটা নিশ্চিত করতে শুধু সতীর হুমকিই দেওয়া হল না, চিতা তুলে মাথায় ডাণ্ডস মেরে পোড়ানোও হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভয়হস্ত মাথায় নিয়ে সর্প হইয়া কামড় দেওয়া সাম্রাজ্য আশ্রিত ভদ্রবিত্ত নবজাগরণী পুরুষ মেয়েদের সতী করাল আবার রামমোহনকে লেলিয়ে কেমন করে সতীর মত প্রাচীন কুসংস্কার বন্ধ ব্যবস্থা করলাম, সে ইতিহাস বাংলায় লেখা হবে। 'দয়া' নামক সাম্রাজ্যের ইগো কণ্ডুয়নের ঝুটা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস আজও সসম্মানে পঠিত হয়। হ্যালহেড খ্রিষ্ট ছাড়া জৈন বৌদ্ধদে হিন্দু দাগালেন, যেটা আজ সঙ্ঘ আর বিজেপির এজেন্ডা - সেটা সে তার তাত্ত্বিক গুরু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে অর্জন করেছে। ব্রিটিশপূর্ব সময়ে আইন ছিল না, অঞ্চল ভেদে, সমাজ ভেদে প্রথা পাল্টাত। বিচার যেহেতু ছোট জায়গায় হত তাই সকলে সকলকে চিনত - খুন বা বড় ফৌজদারি মামলা ছাড়া কিছুই কাজির কাছে আসত না। তো নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার নেপালচন্দ্র সূত্রধর স্মৃতি বক্তৃতা আমরা পাঠকের জন্যে তুলে দিলাম।

এই বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে আমি শ্রী বিশ্বেন্দু নন্দ ও শ্রীমান অত্রি ভট্টাচার্যকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শুরুতেই বলে নিই, যে বিষয়টা নিয়ে আমি আজ আলোচনা করব, সে বিষয়টা আমি কিছু দিন ধরেই চর্চা করছি। তবে ইংরেজিতে। এই নিয়ে বেশ কিছু লেখাপত্র

প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা করার অবকাশ আমার হয় নি। কিছু প্রতিশব্দ নিয়ে ধন্ধে পড়ে যাই। চেষ্টা করছি একটা বোধগম্য প্রতিবেদন উপস্থিত করতে।

আমি আজ বলব ঔপনিবেশিক আইন গ্রন্থে 'আদর্শ ভারতীয় নারী'র এক কল্পিত মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল - যাকে আমি প্রতিস্থাপন বলছি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠবে, 'আদর্শ ভারতীয় নারী'র ভাবমূর্তি কি প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ছিল না? প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই আলোচনা শুরু করি। এই প্রশ্নের সঙ্গে আরও কিছু বিষয় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে,

১) কবে এবং কিভাবে 'আদর্শ ভারতীয় নারী'র কল্পিত বা কল্পায়িত চিত্রটা তৈরি হল;

২) কেনই বা এই চিত্রটি তৈরি করা হল;

৩) বর্তমানে একজন ভারতীয় নারীর জীবনে তার প্রভাব কতটা।

এ প্রসঙ্গে আমি বলে রাখি আমার পর্যালোচনা ঔপনিবেশিক, কিছুটা প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয়ত ভারতীয় নারীর সংজ্ঞা কিন্তু একরৈখিক নয়। তথাকথিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী এবং দলিত শ্রমজীবি এবং নিম্নরেখার নারীর মধ্যে অনেক তফাত। আমার প্রতিবেদনে মূলত প্রতিভাত হবে উচ্চ এবং মধ্যনিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের নারী। এই বক্তৃতায় তার বাইরে আমি নজর দিচ্ছি না।

বর্তমানে এদেশের নারী এক অদ্ভুত দ্বৈত সত্ত্বার মধ্যে দোলাচলে থাকে। বেশীরভাগ নারীর মধ্যে সনাতনী মূল্যবোধ বা ট্রাডিশনাল ভ্যালুজ এবং তথাকথিত আধুনিকতা বা মডার্নিটি, যার নির্দিষ্ট কোনও সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, মনের শেকড়ে গভীরভাবে প্রোথিত। পুরুষতন্ত্রের আধারই হল এই দ্বন্দ্বপূর্ণ চেতনা যেটি নারীর ক্ষমতায়ন বা অগ্রগতির ক্ষেত্রে মস্ত বাধা।

এই বক্তৃতায় আমি ঔপনিবেশিক আইনগ্রন্থ থেকে 'আদর্শ ভারতীয় নারী'র একটি ছবি তৈরি করব। অবশ্য শুধু আইনিগ্রন্থে নয়, নানাবিধ আলোচনাসূত্রেই (ডিসকোর্স) এই ধারণা বিকশিত হয়েছে। আমি আলোচনা করব উপনিবেশের শুরুতে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রচিত *বিবাদার্ণবসেতু*— নাথানিয়েল ব্রেসি হ্যালহেড যেটি ইংরাজিতে অনুবাদ বলা যাবে না, পরিমার্জন বা রেন্ডারিং করেন, ১৭৭৬এর প্রথম ছাপা *আ কোড অব জেন্টু ল'জ*। এই বই বহু ইওরোপিয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

অন্যটা হল *বিবাদভঙ্গার্ণব*। উইলিয়াম জোনস এই গ্রন্থের পরিকল্পনা, বিষয় চয়ন করেন এবং প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে দিয়ে লেখান। গ্রন্থটি

অনুবাদ শুরু করেছিলেন জোনস— কিন্তু তার অকাল মৃত্যুর ফলে হেনরি টমাস কোলব্রুক *আ ডাইজেস্ট অব হিন্দু ল'জ* শিরোনামে বইটি অনুবাদ এবং প্রকাশ করেন। প্রথম প্রকাশ ১৮০০।

এই দুই বইতে 'আদর্শ ভারতীয় নারী'র যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেটি আলোচনা করার আগে আমরা ফিরে যাই অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছুটা আগের সময়ে— অর্থাৎ প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে। তখনও অনেক দ্বৈততা ছিল— কিন্তু অনেকটাই স্বচ্ছ। আমরা দু'ধরণের সাহিত্যে নারীর সামাজিক অবস্থানের চিত্রায়ন দেখি। প্রথমটা লৌকিক সাহিত্য— মূলত মঙ্গলকাব্য আর দ্বিতীয় হল শাস্ত্রীয় বই সমূহ।

মঙ্গলকাব্যের দিকে তাকাই প্রথমে। শুরুতে পর্যালোচনা করব *মনসামঙ্গল* কাব্যগুলো। এই কাব্যগুলোয় দুটো প্রধান মহিলা চরিত্র দেখি— মনসা আর বেহুলা। মনসার কথাই আলোচনা করা যাক। মনসার একটা চোখ নেই। চ্যাং মাছের মত বড় মাথা— তাই তার নাম চ্যাংমুড়িকানি। দেবত্বের কৌলিন্য নেই। শিবের রেতঃপাতে তার জন্ম। নাগ সমাজ তাকে বড় করেছে। কিন্তু উচ্চাশা তার অপরিসীম। তিনি দেবত্বে ভূষিত হতে চান। আমরা দেবী প্রতিমা নারী বলতে যা বুঝি, তেমন কোনও গুণ কিন্তু দেবী মনসার মধ্যে দেখতে পাই না। বিয়ের প্রথমক রাতেই স্বামী জরৎকারু মুণিকে দিলেন এক ছোবল। পরের গল্প অনেক বড়। সঙ্গম না করেই অর্থাৎ এসেক্সুয়ালি জন্মও দিয়েছেন বিষধর নাগের।

দেবীত্বে ভূষিত হওয়ার জন্য কিন্তু মনসা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের দিকে একবারও তাকান নি, তিনি বেছে নিয়েছেন বৈশ্য সমাজকে। কৌলিন্যে খাটো, সম্পদে বলীয়ান এবং সওদাগর হিসেবে তিনি যেহেতু দেশে দেশে ভ্রমণ করেন, তাই গোঁড়ামি কম। মনসা অনেককে কনভার্ট করেছেন— রাখাল, কাজি ইত্যাদি। কিন্তু বেগ পেতে হয়েছিল চাঁদ সওদাগরের বেলায়। তার পুজো পেতে তিনি চাঁদের সাত ছেলেকে মেরেছেন, আদরের ছোট পুত্র লখীন্দরকেও সর্পদংশনে মারলেন। এত অত্যাচার সয়েও চাঁদ সওদাগর অনড়। চাঁদ বণিক মনসার দেবীত্বকে মেনে নেওয়ার জন্য বাঁ হাতে পুজো দিল। বেহুলা— লখীন্দরের নববিবাহিতা স্ত্রী পঞ্চ সতীর মধ্যে অন্যতম। বেহুলার কথা বলার আগে এইটুকু বলব, মেনে নেওয়ার জন্য মন ফিরিয়েছিলেন বেহুলা। মনসা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পূজিত এক দেবী উচ্চ শ্রেণীর মানুষও কিন্তু মনসা পূজা করেন। মনসা কিন্তু আদর্শ নারী নন।

মনসা লখীন্দরকে সর্পাঘাতে মারলেন। বেহুলা তো স্বামীর শব কলার মান্দাসে ভাসিয়ে স্বর্গ অবধি পৌঁছলেন। ঘাটে ঘাটে তাঁকে পুরুষের লোভ এবং লোলুপতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কি হয়েছিল আমরা জানি! কিন্তু বেহুলাকে সাহায্য করেছিলেন আর এক নারী নেতা ধোপানী, যিনি বেহুলাকে ইন্দ্রের সভায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। বেহুলার অপরূপ রূপ এবং নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র লখীন্দর এবং চাঁদ সদাগরের সাত

ছেলের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইন্দ্র দেবতা। কিন্তু তাঁর চরিত্র তো নিষ্কলুষ নয় এবং নারী সম্ভোগ ছিল তাঁর favourite time pass. অতএব বেহুলাকে নিয়ে খুব বেশি বলা যাবে না— শুধু অপরিসীম মনোবল ও সাহস ছাড়া। শেষে এটুকুই বলি যে, মনসা বা বেহুলা ঔপনিবেশিক discourse-এর আদর্শ নারী নয়।

অষ্টাদশ শতকের রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কথা না বললে তো আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তিনি অজস্র কবিতা লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রিয় বিষয় ছিল নারীর অভিসার। অর্থাৎ বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা নারীদের অভিসারে যাওয়া ক্রাইমের পর্যায়ে গণ্য হত না। নারীর আদর্শ তখনও সেট করা হয়নি। অতএব আদর্শচ্যুত হবার প্রশ্নই উঠছে না। আর বিদ্যাসুন্দর কাব্য কি বলা যাবে এখনকার ভাষায় — soft porno? এই কথাটি ব্যবহার করার জন্য ভারতচন্দ্র, আদর্শ সুশীল সমাজ ও ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ যাঁদের আছে তাদের কাছে আমি মার্জনা ভিক্ষা করি। তবে আমি তো আর এটা একা বলিনি, আর নতুন কিছুও বলছি না।

এরপর মঞ্চে প্রবেশ করলেন ঔপনিবেশিক প্রভু। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আগমন হলেও তাঁদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সময় লেগেছিল বেশ কিছু দশক। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হিসাবে শাসন শুরু করলেন। শাসন মানে তো সৈন্য নয়— আইন হচ্ছে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অস্ত্র।

হেস্টিংস শাসন শুরু করেই নিয়োগ করলেন ১১ জন পণ্ডিতকে। 'হিন্দু ল' তৈরি হল। ব্রিটিশরা আসার আগে হিন্দু ল বলে কিছু ছিল না। শাস্ত্র 'ল' ছিল না। শাস্ত্র ছিল নির্দেশমূলক, নৈতিক, আদর্শ সম্বলিত এক বিশাল রচনা সম্ভার। যার শুরু ছিল বেদ থেকে। তারপর হল স্মৃতি। স্মৃতির উপর টীকা। এবং শাস্ত্রকাররা নিবন্ধ লিখতেও শুরু করলেন। নিবন্ধগুলি কোনও একটি বিষয়ের উপর লেখা হত— যেমন দায়তত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, মলমাস তত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ইত্যাদি। আমি এইটির উপর আর বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু এইটুকুই বলি— কেউ আদর্শচ্যুত হল, অন্যায় কাজ করল। স্মৃতি শাস্ত্র বা মীমাংসা যার উপর ভিত্তি করে হিন্দু ল তৈরি হল সেগুলি কিন্তু কোনও ভাবেই জেল বা কারাগারে নিক্ষেপ করার কোন প্রভিশন রাখা হত না। সেখানে বড় জোর বলা হত ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ বা গাভী দান করো, অথবা নরকে নিক্ষিপ্ত হবে, অথবা শৃগালযোনীতে জন্ম নেবে, ইত্যাদি এগুলো তো আইন নয়। আর সব বিধিলিঙে লেখা— অর্থাৎ 'করা হবে'— একথা নয়। করা উচিত। উচিতার্থে বিধিলিঙ।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের তত্ত্বাবধানে লেখা হল *বিবাদার্ণবসেতু*— বিবাদ অর্থাৎ আইনগত সমস্যা নামক সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন। সংস্কৃতে অবশ্য বিবাদ

শব্দটির অর্থ আলাদা। 'বিবাদ', 'তর্ক' এগুলি তত্ত্বমূলক আলোচনার অংশবিশেষ। সংস্কৃত প্রবন্ধে 'ব্যবহার' বলে যে তাত্ত্বিক আলোচনা আছে সেই আলোচনার সঙ্গে ইংরেজি jurisprudence-এর কিছুটা হলেও সাদৃশ্য আছে— আইন নয়— আইনের তত্ত্ব।

বিবাদার্ণব গ্রন্থটি কিন্তু শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য অনুসারে অভূতপূর্ব। অনেকগুলি বিষয় একত্রিত করে সহস্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে কিছু তত্ত্ব, কিছু তথ্য আহরণ করে একটি জগাখিচুড়ি টেক্সট। পূর্বতন নিবন্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও মিল নেই। এখানে বেশি কিছু তো বলা যাবে না। কিন্তু আমার প্রথম বইটিতে আমি আলোচনা করেছি এই গ্রন্থটি হল সম্পূর্ণ ভাবে ঔপনিবেশিক শাসকদের নির্দেশে লেখা। বিষয়গুলিও শাসকদের প্রয়োজন ভিত্তি করে তৈরি। অন্যান্য কিছু বিষয়ের সঙ্গে নারীর সম্পত্তির অধিকার এই গ্রন্থটির প্রধান অংশ।

ন্যাথনিয়েল হ্যালহেড সাহেব এই গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন গ্রন্থটির পারসিক অনুবাদ থেকে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলার দায়ভাগ প্রথা অনুযায়ী বঙ্গদেশে বিভাজিত বা অবিভাজিত সম্পত্তিতে বিধবাদের নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল যেখানে মিতাক্ষরা তত্ত্ব অনুযায়ী বিধবারা শুধু বিভাজিত সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হতে পারতেন। হয়ত তাই সতীদাহ শুধু বাংলাতেই হত। হ্যালহেড সাহেবের A Code of Gentoo Laws-এ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ এবং সতীদাহ প্রথা নিয়ে অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন মোডে ছিল। যাকে বলে twist— যেটা সর্বার্থে deniahonই ছিল।

আমি এখানে বিবাদার্ণব সেতু নিয়ে কিছু বলছি না। Code of Gntoo Law কিন্তু সংস্কৃত আকর গ্রন্থটির কোনওভাবেই আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে ধরা উচিত না। আগেই বলেছি জীমূতবাহনের *দায়ভাগ* বিধবাদের স্বামী মারা যাবার পর পুত্র ও পৌত্রের উত্তরাধিকারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী স্মৃতিকার যেমন রঘুনন্দন, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার সেই ধারাই অনুসারণ করেছিলেন। এছাড়াও *দায়ভাগে*, স্বামী মারা যাবার পর বিধবা স্ত্রীর সম্পত্তি ভাগ হবার সময় সমান অধিকার দিয়েছিলেন। মৃত পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের সঙ্গে অবিবাহিতা কন্যারও সমান অধিকার ছিল।

হ্যালহেড সাহেব এই সব বিধানের বিপরীত নিদান দিলেন। কেনই বা দেবেন না? তৎকালীন ইংল্যান্ডে মেয়েদের সম্পত্তির কোনও অধিকার ছিল না। তাঁরা কোনও অর্থকরী কাজও করতে পারেতন না। তাই হ্যালহেড বিধবার জায়গায় দত্তক পুত্রের কথা লিখলেন অর্থাৎ Male Heir— পুরুষ উত্তরাধিকারী। মেয়েরা কেমন করে ব্রিটিশ সিহংদের কোষাগারে খাজনা দেবে? Weaker Sex তারা। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, হ্যালহেডের বই কিন্তু বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ব্রিটিশ প্রভুদের *মনুস্মৃতি* বন্দনা প্রীতির কথা একটু বলি।

তাঁরা *মনুস্মৃতি*কে হিন্দুদের বাইবেল শুধু নয়— প্রধান আইন গ্রন্থের স্থান দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন জানা নেই। *মনুস্মৃতি* তো স্ববিরোধী টেক্সট। আর এটা স্মৃতিগ্রন্থ নয়। এটা সম্পাদিত হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। এই যে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে সমান ভাগ পাবেন এটি কিন্তু *মনুস্মৃতি*তেই আছে। *মনুস্মৃতি*তে পুত্রিকা বলে একজন মহিলা উত্তরাধিকারীর কথা বলা হয়েছে যাঁর অধিকার পুত্রের সমান। কিন্তু একই টেক্সটে পরবর্তী শ্লোকে ওই সব নিদানের বিরোধিতা করা আছে। আসলে বহু অনামী লেখক পুঁথি নকল করার সময় নিজের মত ঢুকিয়েছেন। এতদ সত্ত্বেও আমরা তো আসল টেক্সট পড়ি না। অনুবাদ পড়ি। আমরা মনুস্মৃতি মনে হলেই বুঝি— পিতা রক্ষতি কৌমারে— ভর্তা রক্ষতি যৌবনে— রবান্তি স্থবিবো পুত্রোঃ— ন স্ত্রী স্বাতন্দ্রমতি। ব্রিটিশ শাসকদের ইন্ডিয়ায় জাহাজ ভেড়ার আগেই এই শ্লোকটিকে মনে হয় মুখস্থ করতে হত।

এই Extra Potation-এর চক্রে পড়ে মনুস্মৃতিতে বিধবাদের জন্য একটা কঠিন বিধান দেওয়া হল— বিধবারা শুধু ফল-মূল খেয়েই থাকবে, মাছ-মাংস ইত্যাদি খাবেই না। আর পুরুষসঙ্গ তো একেবারেই বর্জন করতে হবে। আমি ব্রিটিশযুগের প্রথম দিকে আইনের নথি পড়তে গিয়ে এই সব নির্দেশের প্রায়শই প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি।

মনুস্মৃতি মানে কী? মনু বলে একজন বা একাধিক সমাজবিদ যে সব নির্দেশ প্রাচীন যুগে উচ্চারণ করেছিলেন তার স্মৃতি কাহন — অর্থাৎ যতটুকু মনে আছে তার উপর ভিত্তি করে একটি পুস্তক। উইলিয়াম জোনস সাহেব কিয়ৎ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষায় বললে) সংস্কৃত অধ্যয়ন করে একেবারে মনুস্মৃতি অনুবাদ করে ফেললেন। তাঁর শিরোনাম হল— Institute of Hindu Law or Ordinations from Many। Hindu Law। কিন্তু এই শব্দটা কোথা থেকে এল? স্মৃতি মানে তো 'ল' নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ শাসকগণ 'ল' বলতে যা বুঝতেন সেই সংজ্ঞাই তো আলাদা— অন্য দেশ, অন্য মাটি, অন্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে law তৈরি হয়েছে। তাহলে অনুবাদের সঙ্গে *মনুস্মৃতি*র নামের পরিবর্তনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী? মনুস্মৃতিতে শুধু মহিলাদের পরাধীনতার কথাই বলা হয়নি আরও অশ্লীল সব কথা বলা হয়েছিল। যেমন মহিলারা নাকি বাপ বয়স কিছুই বিচার না করে যত্রতত্র ব্যাভিচার করতে ঘুরে বেড়ান। বিধবাদের পুরুষ মুখ দর্শন করার অধিকার নেই। এই কটি শুধু নমুনা দিলাম।

সে যাই হোক। যে টেক্সটে মহিলাদের নিয়ে এত এত নেগেটিভ কথা বলা আছে জোনস তাকেই law-এর মর্যাদা দিলেন! এজলাসে বসে সাহেব জজ নির্বিবাদে মেয়েদের অর্থনৈতিক এবং সম্পত্তির অধিকারের বিরুদ্ধে রায় দেবার জন্য মনুস্মৃতির মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্র পেলেন। তাহলে 'আদর্শ ভারতীয় নারী'র চিত্র অঙ্কিত করার জন্য প্রথম ধাপ হল *মনুস্মৃতি*কে law হিসাবে উপস্থাপিত করা। জোনসের পরে

মনুস্মৃতি যে কতগুলি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তার হিসাব করা মুশকিল। অর্থাৎ অন্য কিছু দিক বাদই দিলাম— সারা পৃথিবীতে মানুষ জোনস নির্ভর অনুবাদ সূত্রে এটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে যে ভারতীয় নারী প্রথম জীবনে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে পুত্রদের অধীন। আদর্শ ভারতীয় নারীর স্বাধীনতা নেই। যারা এই বৃত্তের বাইরে বেরোতে চায় তারা নষ্ট পতিতাসম।

অনেক কথা তো বললাম এতক্ষণ। শেষ করি সতীদাহ নিয়ে। প্রথমে জানাই সতীদাহ নিয়ে *মনুস্মৃতি*তে একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি। Stringent austere widow hand বা বিধবা নারীদের যে ক্লেশকর জীবন মেনে নিতে হয়, সেটা নিয়ে কয়েকটা শ্লোক আছে। অনেকগুলি নয় কিন্তু। এছাড়া সতীদাহ নিয়ে পুরাকাল থেকেই কোনও গ্রন্থিত পুঁথি আজ অবধি পাওয়া যায়নি। জীমূতবাহন একাদশ শতাব্দীতে *দায়ভাগ* লিখে বিধবাদের সম্পত্তির অধিকারের নিদান দিলেন। তারপরের ইতিহাস আমরা জানতে পারি না। পঞ্চদশ শতকের শেষে বা ষোড়শ শতকের শুরুতে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য— প্রবাদ প্রতিম পণ্ডিত ও শাস্ত্রকার *শুদ্ধিতত্ত্ব* বলে একটি Discourse লিখলেন। তিনি আঠাশটি পুথি লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটি *শুদ্ধিতত্ত্ব*।

এই পুথিটি সতীদাহর উপর লেখা। এই গ্রন্থটি ন্যায়-মীমাংসার স্টাইলে উপস্থাপিত হয়েছে। মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে এটি একটি তর্ক বা বিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত— সতীদাহ মানে কি আত্মহত্যা? শুদ্ধি মানে পবিত্রতা বা পূণ্য। শুদ্ধিতত্ত্ব এই পবিত্রতা বা পূণ্য কনসেপ্টকে সতীদাহর উপর প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ রঘুনন্দন লিখেছেন যে সতী হওয়া আবশ্যিক নয়। তবে যে নারী সতী হবে সেই নারী অপার পূণ্য অর্জন করবে। এটি পূণ্যকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূণ্য। সতী নারী দুর্জয় পূণ্য অর্জন করবে তার স্বামীকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করতে। ঊর্ধ্বতন অধস্তন চোদ্দ পুরুষকে স্বর্গে নিয়ে যেতে। এবং একজন মানুষের শরীরে যত লোম আছে তত সহস্রবছর সেই নারী স্বামীর সঙ্গে স্বর্গবাস করবে। তবে রঘুনন্দন সতীকে পুণ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

হ্যালহেড কী ভেবে সতীদাহ প্রথাকে Gentoo Law-এ গৌরব গাথার স্থান দিলেন সে ইতিহাস আমার জানা নেই। আমি ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করি—

It is proper for a woman, after her husband's death burn herself in the fire with corpse. Otherwise she should live a of inviolable chastity and that is how she can go to heaven. She will go to hell if she violet the chastity.

ভাবুন তো এমন একটি 'আইন' প্রণয়ন করা হল ঔপনিবেশিক আইন গ্রন্থে।

সতীদাহ হল proper-ঠিক। সতী না হলে মেয়েদের সতীত্ব বজায় রাখার দায়িত্ব অলঙ্ঘনীয়। রাখলে স্বর্গে যাবে না হলে নরকে যাবে। এটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে সতীত্ব লঙ্ঘন করার জন্য সাহেব কোনও শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারেননি। কারণ *জেন্টু কোডে* শাস্ত্রভিত্তিক আইন যতই লঙ্ঘিত হোক, কোনও শাস্ত্রে এর কোনও আইনমূলক শাস্তির উল্লেখ নেই।

সতী/অসতী নিয়ে কোলব্রুক সাহেব ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লিখলেন— The Duties of a Faitleful Widow'। এই আর্টিকলটি আসলে লেখা সতীদাহর প্রত্যক্ষ বিবরণের উপর। কোলব্রুক এক 'নমস্য আদর্শ নারীকে' স্বামীর চিতায় ওঠা এবং পুড়ে যাওয়ার বর্ণনা করেছেন— অর্থাৎ এই আর্টিকলে তিনি একজন আদর্শ ভারতীয় নারীর বর্ণনা করেছেন। স্পষ্ট ভাষায় সে কথা বলেওছেন।

সর্বশেষে কোলব্রুক Digest of Hindoo Law-তে সতীদাহ নিয়ে যা ব্যাখ্যা করেছেন তার একটি খণ্ড তুলে ধরি ইংরেজিতে — Learn that power of that widow, who hearing her husband has deceased, and been burned in …. Region, speedily cautes herself to fine.

কেলব্রুক সাহেব সতীদাহকে শুধু ঠিক বলেননি— বলেছেন নারীদের ক্ষমতায়নের এক সোপান। সতী নারীরা power অর্জন করেন।

তাহলে রঘুনন্দনের পূণ্য থেকে, হল হ্যালহেডের 'সার্বিক' মূল্যায়ন এবং অবশেষে সতীদাহ কোলব্রুক সাহেবের কাছে হয়ে উঠল নারীর ক্ষমতায়ন। Digest of Hindoo Law কিন্তু ইংল্যান্ডের আইন প্রণেতা ব্ল্যাকস্টোনের The … of Law in England-এর ভাবধারায় প্রণীত।

আমি আপনাদের কাছে যে ন্যারেটিভটি উপস্থাপিত করলাম এর কোনও উপসংহার নেই। কারণ রাস্তাঘাটে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা এই 'আদর্শ ভারতীয় নারী'র ভাবমূর্তি বহন করার চাপ বহন করে চলেছেন। আদালতে ধর্ষিত নারীর চরিত্র কেমন ছিল তাই নিয়ে কাঁটাছেঁড়ার শেষ থাকে না। আজও আদর্শ নারীরা নীরবতা পালন করে চলেছেন— শত অত্যাচারেও। আজও ডিভোর্সী বা বিধবা নারীর দিকে আঙুল তোলা বন্ধ হয়নি।

আজ এই পর্যন্তই থাকে।

নমস্কার।

‘তদানীন্তন ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলায়, প্রচলিত ঐতিহ্য ও শাস্ত্র— দু’দিক থেকেই

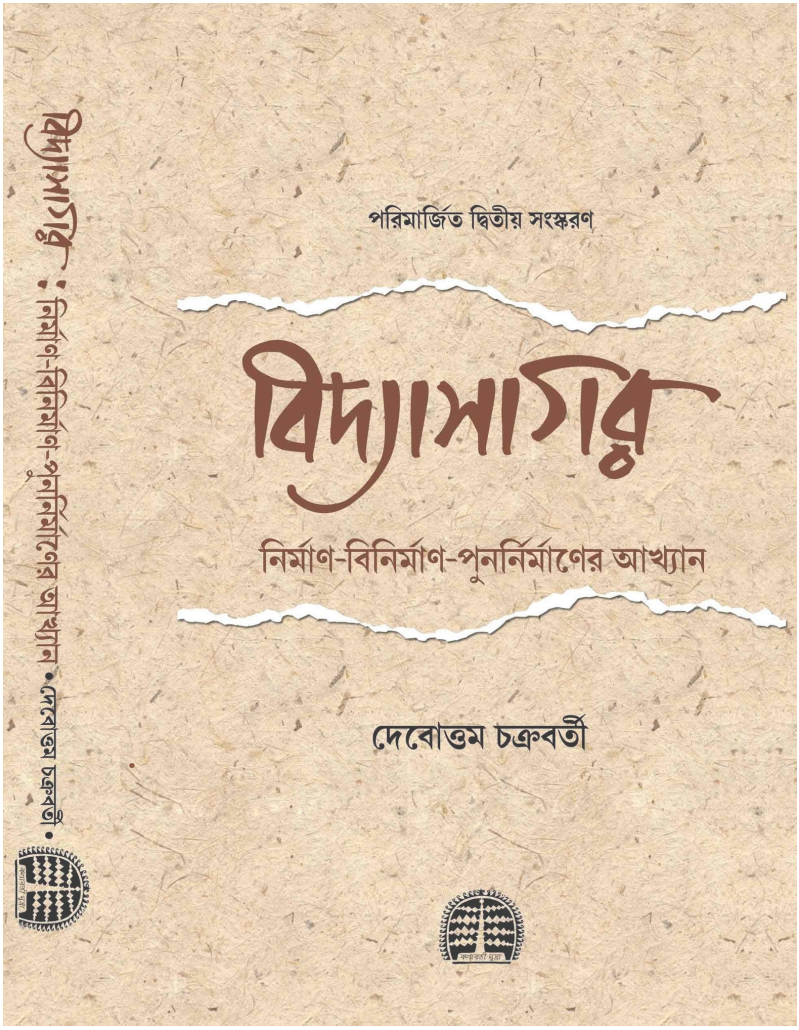

সম্পত্তিতে নারীদের, এমনকি বিধবাদেরও অধিকারের বিষয়টিকে মেনে নেওয়া হয়। এই সময়ে বাংলার যে তিনটি অন্যতম বৃহৎ জমিদারির প্রত্যেকে কোম্পানিকে বছরে ১ লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি রাজস্ব দিত, সেই তিনজন জমিদারই ছিলেন মহিলা ও বিধবা। বছরে ৩৫০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি রাজস্ব দেওয়া বর্ধমান ছিল তিলকচাঁদের বিধবা পত্নী ও তেজচাঁদের জননী রানি বিষ্ণুকুমারীর শাসনাধীন। ২৬০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি

বার্ষিক আদায়যুক্ত রাজশাহী শাসন করতেন শ্রদ্ধেয়া রানি ভবানী, যিনি ১৭৪৮ সালে রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে রাজশাহীর রাজকার্য পরিচালনার ভার নিজের হাতে নেন। আর কোম্পানিকে বছরে ১৪০,০০০ পাউন্ডেরও বেশি খাজনা দিতেন দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথের বিধবা পত্নী রানি সরস্বতী।'

অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডের মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার

কিন্তু সমসাময়িক ইংল্যান্ডে মহিলাদের সম্পত্তির মালিকানা পাওয়া কিংবা সেটি পরিচালনা করার অনুমতি ছিল না তার প্রমান Sir William Blackstoneএর 'Commentaries on the Laws of England'। লিবার্টি ইউনিভার্সিটির গবেষক Amber Kamp, Rights Most Precious - Common Law Female Property Rights from Early Modern England to Colonial Virginia প্রবন্ধে Commentary on the Laws of England, Book II, Chapter I, 1765–1769. Lonang Institute, 2005. http://www.lonang.com/exlibris/blackstone/ সূত্রে বলছেন Sir William Blackstone, in his Commentaries on the Laws of England, wrote that there is nothing which so generally strikes the imagination, and engages the affections of mankind, as the right of property; or that sole and despotic dominion which one man claims and exercises of the external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe.

এম্বার কাম্প লিখছেন, ব্ল্যাকস্টোন মনে করতেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে সম্পত্তি ছিল ভদ্রলোকদের সংজ্ঞায়িত গুণ। অভিজাতদের মর্যাদা নির্ণয় হত সম্পত্তি মালিকানা সূত্রে। নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সাধারণ আইন, নারীদের তাদের স্বামী বা পিতার অনুমতি ছাড়া সম্পত্তি ধারণ করতে বা তাদের নিজস্ব আইনি পরিচয় ধারণ করতে বাধা দিত। সাধারণ আইন অনুসারে, পুরুষরা তাদের ইচ্ছামত সম্পত্তি ধারণ, ক্রয়, বিক্রয় এবং বিনিময় করতে পারত। নারীরা কী ধরণের সম্পত্তির মালিক হবেন সেটা নির্ণয় করত পুরুষেরা, তাদের সম্পত্তির অধিকার আদৌ দেওয়া হবে কি না সে অনুমতিও পুরুষ দিত, তারা কখন সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন এবং কীভাবে তারা সম্পত্তি পরিচালনা করবেন, সেটাও ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এই আইনী বিধিনিষেধ সত্ত্বেও, ব্রিটিশ মহিলারা ঘুরপথে সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।

তিনি বলছেন, ইংলন্ডের বিচারক, রক্ষণশীল টোরি দলের সদস্য, এবং অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডের সাধারণ আইন কমেন্টারিজ অন দ্য ল'জ অব ইংলন্ডের সংকলক উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন, অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডের সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে

বলছেন— সম্পত্তি হল পুরুষত্ব, ভদ্রবিত্তত্ব, সর্বোপরি অভিজাততান্ত্রিকতার অন্যতম চিহ্ন। একমাত্র অভিজাত পুরুষদের অধিকার, তার ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পত্তি রক্ষা হয়, সম্পত্তি বিক্রি হয় এবং সম্পত্তি হাত বদল হয়। নারীরা কোন ধরনের সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার অনুমতি পাবেন, আদৌ তাদের সম্পত্তির মালিক হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে কি না অথবা কীভাবে তারা সম্পত্তির পরিচালনা করবেন সে বিষয়েও তাদের অধিকার ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল অষ্টাদশ শতক জুড়ে। মহিলারা পুরুষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। মহিলারা কি ধরণের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কি না, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা একমাত্র পুরুষেরই ছিল।

ব্রিটিশ অভিজাত, ভদ্রবিত্তদের সমস্যা হল তারা নতুন ধরণের মুসলমানহীন কলকাতা জমিদারির বসতিতে দেখছে বাংলা জুড়ে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত। অন্তত ২০ জন মহিলা জমিদার জমিদারি চালান, ট্যাক্স দেন, বাজারে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করেন, যুদ্ধ করেন, বিদ্রোহ করেন, রাস্তা ঘাটে মেয়েদের চলাফেরা করতে, প্রকাশ্যে দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে দেখা যায়, ধর্মীয় গুরুমা-রা অন্য এবং নিজের ধর্মের শিষ্য-শিষ্যাদের জমি সম্পদ দান করেন। ৫০-৭০% জমিতে রাজস্ব ছিল না - সে সব জমি/সম্পত্তি/উৎপন্ন মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পুরুষ-মহিলা কারিগর দাদন, অর্থাৎ অগ্রিম নিয়েও বলতে পারেন কাঁচামালের দাম বেড়েছে আমি পণ্য দিতে পারব না - এবং রাষ্ট্র-শ্রেষ্ঠী-কর্পোরেটদের কিছুই করার থাকত না। এই অবস্থাকে আগামী দিনে যারা ১৯০ বছরের উপনিবেশ তৈরি করবে, তারা স্বেচ্ছাচারিতা বলছে, ডেসপট বলছে। বলছে, এদেশের লোকজনের আমরা উন্নতিতে বদ্ধপরিকর, অথচ এই ডেসপটেরা উন্নয়নের, আইন গিভারদের তৈরি সাম্রাজ্যের লজিক মানছে না - অন্য লজিকে সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। রাষ্ট্রের এই ডেসপটেরদের নিয়ম বিধান চললে ঔপনিবেশিক কাঠামো চলবে কি করে? জ্ঞানগঞ্জের গবেষক অত্রি ভট্টাচার্য যেমন বলছিলেন এডমন্ড বার্ক বলছেন হাইতির সেন্ট ডমিনিকায় আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা কৃষ্ণাঙ্গ দাসেরা বিদ্রোহ করছে; ব্রিটিশরা বুঝতে পারছে না, তারা ডমিনিকার অধিকাসীদের উন্নতির জন্য বদ্ধ পরিকর অথচ সেই ডেসপটরা তাদের ভালমানুষি না বুঝে তাদের ওপর দলে দলে আক্রমণ নামিয়ে আনছে। কি অনাচার! একই কাণ্ড বাংলায় হচ্ছে।

তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্ল্যাকওয়েল নীতি অনুসারে প্রথম প্রকল্প নিল মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার, জমিদারি চালানোর অধিকার কেড়ে নিয়ে অন্দরমহলে ঢোকানোর, উল্টোদিকে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত নতুন অনুগত তৈরি করার কাঠামো নির্মাণ করা, যারা এই উপনিবেশের লুঠ খুন অত্যাচারের আধুনিকতাকে মাথা নামিয়ে মেনে নেবে, প্রগতি আখ্যা দেবে। বাংলায় ব্রিটিশ অভয়হস্ত মাথায় নিয়ে রামমোহনের বাবা, দাদা এবং পরে রামমোহন নিজেই

কোম্পানির লুঠের বলে বলীয়ান হবেন, কোম্পানির সহায়তায় বাংলার মেয়েদের হ্যালহেড কোডে সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়ার অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বাংলার মেয়েদের জন্যে সতীর পরিবেশ তৈরি করবেন, এবং রাষ্ট্রের প্রণোদনায় রামমোহনই মহিলাদের উদ্ধারকর্তা সাজবেন।

২৫০ বছর পরে কিছু পাল্টেছে?
কিছুই না।

দেবোত্তম চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর নির্মাণ বিনির্মান পুনর্নির্মানের আখ্যান, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলাবতী মুদ্রা, পশ্চিমবঙ্গ

Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England

Amber Kamp, Rights Most Precious - Common Law Female Property Rights from Early Modern England to Colonial Virginia

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
অক্ষরযাত্রা প্রকাশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'পলাশীর প্রান্তরে আজ...' শীর্ষকে প্রকাশিত

২। টেগোরল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং সাজাহান আলি
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১-এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বই-এর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বাম-আন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকাকালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০টা হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্ক-একাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

मनु

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা ছিল - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম ছিল গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি জীবধারণের ভিত্তি, যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর; আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন করি, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজে নিজে তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর হকার চাষীর এ এক অনন্ত শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; চলতি পুথিতে বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়_মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার